

ভাদ্র ১৪১৩ : সেপ্টেম্বর ২০০৬

অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

ভাস্কর চক্রবর্তী



ভাস্করদা যে প্রথম প্রস্তাবেই রাজি হবেন সাক্ষাৎকার দেওয়ার বিষয়ে, ভাবিনি। ওঁর সঙ্গে আমাদের পত্রিকার পূর্বপরিচয় থাকলেও, আমাদের সকলের ছিল না। তাই উনি সম্মত হওয়ায় কিছুটা বাড়তি উৎসাহই পাই। জোরকদমে শুরু হয় কাজ। ২০০২-এর ১৭ ও ২২ মে বেশ কয়েক ঘন্টায় এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারের লিখিত রূপটিতে একটু 'ফাইন টাচ' দেওয়ার জন্য নিয়ে রেখেছিলেন ভাস্করদা। নিজের কাজকর্ম তো বটেই, এমনকী ঘোর অসুস্থতার মধ্যেও তিনি শুধরে দিচ্ছিলেন আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো — কিছুটা সাজিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের কথাও। না, শেষপর্যন্ত পুরোটা পারেননি...। ছোটোখাটো কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছে। তবু, তাঁর কলম-চালানো পাণ্ডুলিপিতে আমরা বড়োরকম কোনও বদল আনতে চাইনি। বরং চেয়েছি, বাক্যবিন্যাসে তাঁর 'মুখের কথা'-কেই বজায় রাখতে।

সাক্ষাৎকারটি প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আংশিক দায় পরিস্থিতির। বাকি অংশের ক্ষেত্রে আমরা সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী। তবে, কাজটি যে শেষপর্যন্ত করা সম্ভব হল, এজন্য বাসবী চক্রবর্তী ও কৌষিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

শূন্যস্থান পূরণ

যখনই মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, সিগারেট ধরাই

ধূমপানের সময় ঈষৎ ঝাঁকিয়ে কিংবা আলতো টোকায় ছাইটুকু ফেলে দিতে দেখিনি। কোনোদিনই দেখিনি। ক্রমশ পুড়ে-পুড়ে ছাই জমে উঠত সিগারেটের মুখে — গাঁজার মিশেল থাকলে যেমনটা হয়, অনেকটা সেরকমই। যেভাবে কথার পিঠে জমে ওঠে কথা, কিংবা বিষাদের ঘরে আনাগোনা করে আরও বিষাদ। একটা গানের রেশ ধরে আরেকটা গান...।

ভাস্কর চক্রবর্তী। না, তাঁর কোনও স্মরণসংখ্যা নয়। আর-পাঁচটা ইস্যুর মতোই আরও একটা 'বোধশব্দ'। চেয়েছিলাম ভাস্করদার হাতেই সংখ্যাটা প্রথম তুলে দিতে। ঢের দেরি হয়ে গেল। একটুর জন্য লাস্ট ট্রেনটা পেয়ে গিয়েছেন ভাস্করদা...।

'... *কত যে ট্রেন রাত্রিবেলা চলে যায় শহর পেরিয়ে*'

কারো মৃত্যুর পরপরই তাঁকে নিয়ে কাজ জমে ভালো! বাংলা বাজারে এই ফ্যাশনের কাটতিও নেহাত মন্দ না। কিন্তু এটা স্পষ্ট করা দরকার, লোক-দেখানো অতিভক্তির বমনে আর স্মরণসংখ্যার সেই মহামিছিলে আমরা শামিল নই।

শামিল হওয়ার প্রশ্নও নেই। মাফ করুন — আমরা বিশ্বাস করি না, মৃত্যু ভাস্কর চক্রবর্তীকে মারতে পারে! শুনলে থ্রিলারের মতো লাগবে, কিন্তু আজকেও, এই একটু আগেই তো আড্ডা মেরে এসেছি ওঁর সঙ্গে। তিনতলার ঘরে বুকে বালিশ দিয়ে আধশোয়া। দিব্যি চলল কবিতা, গান। সঙ্গে চা আর ফিলটার উইল্‌স।

ছাই জমে উঠছিল সিগারেটের মুখে। তারপর ভারী হতে-হতে কখন যে খসে পড়ছিল...। সত্যি বলতে কী, ভাস্করদা আজও এসব খেয়াল করেননি!

সম্পাদক ও প্রকাশক : সুস্নাত চৌধুরী
সহ-সম্পাদকমণ্ডলী : সন্বিত পাল, জয়িতা দাশগুপ্ত ও অনির্বাণ ভট্টাচার্য
যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ ▫ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২
বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@banglalive.com
অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া
মুদ্রণ : ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কল-৬৯
বন্ধুত্বে : শিবব্রত বসু, তন্ময় দাম, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ চট্টোপাধ্যায়
অতীন ভট্টাচার্য, সুব্রত ঘোষ, দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক মল্লিক
রণিত চক্রবর্তী, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, অভিষেক ভৌমিক
অনির্বাণ ভৌমিক, বিশ্বজিৎ পাল, প্রসূন মজুমদার
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, নীলাদ্রি সরকার, সুছন্দ চৌধুরী ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

ভাস্কর চক্রবর্তী



ভাস্করদা যে প্রথম প্রস্তাবেই রাজি হবেন সাক্ষাৎকার দেওয়ার বিষয়ে, ভাবিনি। ওঁর সঙ্গে আমাদের পত্রিকার পূর্বপরিচয় থাকলেও, আমাদের সকলের ছিল না। তাই উনি সম্মত হওয়ায় কিছুটা বাড়তি উৎসাহই পাই। জোরকদমে শুরু হয় কাজ। ২০০২-এর ১৭ ও ২২ মে বেশ কয়েক ঘন্টায় এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারের লিখিত রূপটিতে একটু 'ফাইন টাচ' দেওয়ার জন্য নিয়ে রেখেছিলেন ভাস্করদা। নিজের কাজকর্ম তো বটেই, এমনকী ঘোর অসুস্থতার মধ্যেও তিনি শুধরে দিচ্ছিলেন আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো — কিছুটা সাজিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের কথাও। না, শেষপর্যন্ত পুরোটা পারেননি...।

ছোটোখাটো কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছে। তবু, তাঁর কলম-চালানো পাণ্ডুলিপিতে আমরা বড়োরকম কোনও বদল আনতে চাইনি। বরং চেয়েছি, বাক্যবিন্যাসে তাঁর 'মুখের কথা'-কেই বজায় রাখতে।

সাক্ষাৎকারটি প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আংশিক দায় পরিস্থিতির। বাকি অংশের ক্ষেত্রে আমরা সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী। তবে, কাজটি যে শেষপর্যন্ত করা সম্ভব হল, এজন্য বাসবী চক্রবর্তী ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

আপনার লেখালিখির শুরুতে বাংলা কবিতার আকাশে এক ঝাঁক নক্ষত্র — শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু ও আরও অনেকে। এর মধ্যে কীভাবে আপনি স্বতন্ত্র হয়ে উঠলেন? কতটা সচেতনতাই বা ছিল এই আলাদা হওয়ার ক্ষেত্রে, প্রাথমিকভাবে?

❑ ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে কবিতার আবহাওয়াটা এতই সুন্দর আর পরিষ্কার ছিল যে, কেউ সত্যি ভালো একটা কবিতা কোনো ছোটো পত্রিকায় লিখলেও সেটা খুব তাড়াতাড়ি কবিতার পাঠকদের কাছে পৌঁছে যেত। আমি যখন লিখতে শুরু করি, বাংলা কবিতায় তখন সত্যিই দু-একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। কলকাতা তখন আমার কাছে পৃথিবীর কোনো শহরের থেকে কম কিছু ছিল না। আমার একটা ইচ্ছে ছিল যে আমি একটু ভালো কবিতা লিখব। এই যে সকলে কবিতা লেখে, কবিতা লেখার মানেটা কী? অর্থাৎ জীবনটা দিয়ে, জীবনটা এতই বড়ো আর এত সুন্দর যে, জীবনে চার-পাঁচটা কবিতার বই এমন কিছু নয়। সেটা এমন কিছু আহামরি সাফল্য নয়।

কিন্তু ওই যে, খুব ভালো কবিতা লিখব। তা, লিখছি কবিতা, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না। একদিন মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলার ওই সময়টায় সিনেমা হাউসগুলোতে একটা মর্নিং শো হত। সেরকম একটা শো দেখতে গেছি, একা একদম। তা আমি ওই সিনেমা হলটার বাইরে দাঁড়িয়ে একা-একা সিগারেট খাচ্ছি। খেতে-খেতে হঠাৎ কিছু কবিতার লাইন, আমার মনে যে ভাষায় এল তাতে আমার ভেতর-ভেতর একটা আনন্দ হল। এর ভেতরে সচেতনতা ছিল না। আসলে আমি বোধহয় কী একটা খুঁজছিলাম এবং যা খুঁজছিলাম সেটা বোধহয় পেয়ে গেছিলাম। সেরকম মনে হচ্ছিল। আর্কিমিডিস যেরকমভাবে ছুটেছিল, আমিও সেভাবেই ছুটে গিয়েছিলাম, কিন্তু খুব ভেতর-ভেতর। সেইটা নিয়ে কবিতা লিখলাম, বাড়িতে এসে। তেমন ভালো লাগল না, তবুও লেখাটা ছাপতে দিয়ে দিলাম, '*কৃত্তিবাস*'-এ। আরও দু-একটা এদিক-ওদিক ছাপা হয়েছিল। সে অতি নগণ্য এবং বাজে কবিতা। কিন্তু এই যে '*কৃত্তিবাস*' থেকে ছাপা শুরু হল, এরপরও নিজের মনের মতো নয় এরকম লেখা হয়তো দু-একটা হয়েছে, তবে যতক্ষণ না আমার ভেতর থেকে উঠে আসছে — 'হ্যাঁ কবিতাটা ঠিক আছে। এটাই আমি চাইছিলাম।' — ততক্ষণ আমি কবিতাটা কোথাও ছাপতে দিতাম না। পড়ে থাকত।

***'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'* গ্রন্থটিতে বেশ কিছু শব্দের প্রতি আসক্তি লক্ষ করা গেছে। সেই সব শব্দগুলি ফিরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে আপনার কবিতায়। যেমন, 'জুতো', 'বেড়াল', 'বারান্দা' ইত্যাদি। শব্দের এই একাধিক ব্যবহারের পেছনে বিশিষ্ট কোন চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল?**

❑ আমার প্রত্যেক বইতেই আমার জীবনের সঙ্গে, কিছু দৃশ্যের সঙ্গে, কিছু শ্রুতির সঙ্গে জড়ানো শব্দ এসে গেছে। হ্যাঁ, সারা বইতেই অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন প্রণবেন্দুদা আমার সম্পর্কে একটা লেখা লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, 'জুতো' শব্দটা উনচল্লিশবার '*শীতকাল...*'-এ আছে। এখন, ঠিক উনচল্লিশবার লিখব বলে তো ওটা ওরকমভাবে লিখিনি, কিন্তু তখন যে জীবনটা আমার চলছিল, তাতে যা যা আমায় ক্লিক করছিল, সেগুলো চলে এসেছে। আমার মনে হয়, কেউ যে নাটক করছেন, ফিল্ম করছেন, কবিতা লিখছেন, এই যে বারবার কিছুর ফিরে আসা, এর থেকে কিছু কিছু কথা, ছবি, জিনিস পাঠকের কাছে অন্তরঙ্গ-পাচার করা যায় এবং আরও একটা ডাইমেনশন দেওয়া যায়। যেমন, '*এসো, সুসংবাদ এসো*'-তে কতগুলো 'আন্তরিক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'ওগো'। 'ওগো' শব্দটা কিন্তু আমাদের সময়েও কেউ লিখত না। আমিই এটাকে জোর করে বারবার চালিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।

***'শীতকাল...'*-এর যে ফর্ম এবং সে সময় আপনার যে জীবন — সব মিলিয়ে সুস্থিতি নেই; একটা ছটফটানি রয়েছে, কষ্ট রয়েছে...**

❑ হ্যাঁ, সেটা বলা যায়। অর্থাৎ সফল প্রেম নেই, ব্যর্থতা রয়েছে। যখন '*শীতকাল...*'-এর পদ্যগুলো লিখছিলাম তখন তো আমি এরকমভাবে ভেবে রাখিনি, লাইনগুলো এরকমভাবে সাজাব। এটা ভেতর থেকেই চলে এসেছে। সবচেয়ে মজার কথা কিংবা ভয়ের কথা এই, আমাকে ওই সময়ের একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বলেছিলেন — 'তোমার কবিতার একটা পংক্তির সঙ্গে পরের পংক্তিটার একটা স্ত্রী আর পুরুষের সম্পর্ক আছে। এরকম ধরনের মনে হয়...'। আমি তো খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

'রান্নাঘর' বিষয়টিও আপনার লেখায় অনেক জায়গায় বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে।

❑ আমাদের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার — বাবা শুধু স্কুলে চাকরি করেন, এরকম একটা বাড়িতে রান্নাঘরটা হচ্ছে একটা বিশাল ব্যাপার। কী হচ্ছে না হচ্ছে, মা সারাক্ষণ বসে আছেন, আজকের বাজারটা কী এল, এরকম একটা আগ্রহ থেকে যায়। তা সেরকমভাবে বললে আমার প্রায় সমস্ত কবিতাতেই, 'রান্নাঘর' শব্দ না থাকলেও একটা রান্নাঘরের গন্ধ আছে। এই 'রান্নাঘর' যেন একটা চেনা জিনিস। আসলে তখন আমি বাড়িতে বেশি থাকতাম না। রাস্তায় খুব ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু যতক্ষণ থাকতাম বাড়িতে, বাড়িটাকে প্রত্যেক মুহূর্তে আমি ছোটো করে নিয়ে আমার হাতের তালুতে রেখে দেখতে পেতাম এবং তার পাল্‌সটাও আমি পেতাম।

'খেলা' — আপনার লেখায় খেলার অনুষঙ্গ প্রচুর। *'শয়নযান'*-এ আপনি বলেছেন, আপনি খেলোয়াড় হতে পারতেন। খেলার প্রতি এই অবসেশন কীভাবে জন্ম নিল?

❑ না, অবসেশন না। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এটা কেউ বিশ্বাস করে না, জান? এখন তো শুধু মাঝে মধ্যে ক্যারম খেলি। আগে আমি আর কিছু খেলতে পারি না-পারি, ফুটবলটা পারতাম। আমি যখন খেলাটা ছেড়েছি, তখনও আমার তিনটে বুট! আন্তঃকলেজ খেলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। আর, খেললে কেন ভালো খেলব না? রাতদিনই তো খেলতাম। তারপর হঠাৎ চৌষট্টি সালে আমায় চশমাটা নিতে হল। তখন ভাবলাম, না, আর খেলা ঠিক হবে না।

একটু অন্যভাবে বলছি — 'খেলা' শব্দটার যে ব্যঞ্জনা, যে দ্যোতনা, এটাকে আপনি কবিতায় বা আপনার জীবনে কীভাবে দেখেছেন?

❑ তুমি যে খেলাটার কথা বলছ, সেই খেলাটা হচ্ছে — আমাদের বন্ধু তুষার (রায়) তো ডেথ-ডেথ একটা খেলা বার করেছিল। আমিও ভেবেছি এই জীবন-জীবন খেলা একটা, জীবনটাকে নিয়ে খেলা করার একটা ব্যাপার বা মৃত্যুকে নিয়েও খেলা করার একটা ব্যাপার...।

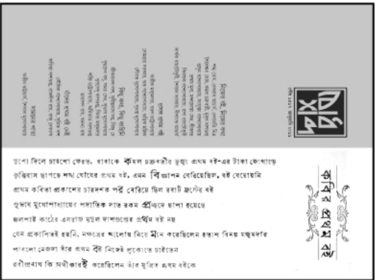
একটু অন্য বিষয়ে বলি, আপনার কবিতায় এবং '*শয়নযান*' গদ্যে আপনার ছোটোবোনের অনুষঙ্গ বারেবারে পাই।

❑ আমি তো বড়ো হয়েছি বলতে গেলে দিদিদের কাছে। মা ছিল, আর পাঁচ-ছ-জন দিদি ছিল। আর যার উপর মাস্টারি করতে পারতাম সে হচ্ছে ছোটোবোন। যার ফলে সম্পর্কটা খুব ভালো ছিল। একদিন এক পরিচিত বললেন যে, "ছোটোদের কবিতা ছাপানো হচ্ছে, পাঁচশো বছরের। তোমার 'ছোটোবোন' কবিতাটা আমি নিয়েছি।" আমি বললাম, 'করেছ কী! এটা ছোটোদের কবিতা নয়, এটা বড়োদের জন্য।' সেদিন আবার বারাসাত থেকে একটা দল এল, কয়েকটি ছেলে, তাদের মধ্যে একটি ছেলে, সে তার অফিসে কবিতাটা শুনিয়েছে। শ্রোতারা শুনে বলেছে, এক্ষুনি বইটা 'ব্যান' করে দেওয়া উচিত। কবিকে ধরে পেটানো উচিত।

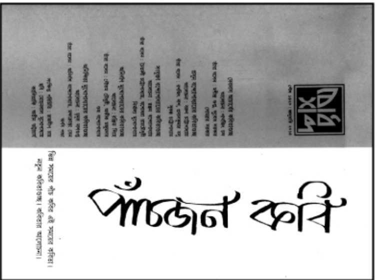
এখন কথা হচ্ছে যে এই ছোটোবোনকে যদি ভালোই না বাসতাম, তাহলে এই গদ্য '*শয়নযান*'-এ লিখলাম কেন? একটাই শুধু কষ্ট আমার ছোটোবোন সম্পর্কে যে, ও শেষ সময়ে যখন হাসপাতালে ছিল, শেষ দু-একদিন আগে আর কী, আমায় দেখতে চেয়েছিল। তা, আমি সেদিন বেরিয়েওছিলাম। আটকে গেছিলাম, যেতে পারিনি। স্নেহ তো নিম্নগামী। ছোটোবোনের সঙ্গে আমার একটা ভেতর-ভেতর সম্পর্ক ছিল। মানে, খুবই গভীর। আবার ঝগড়াও হত।

আপনার লেখালিখির একটা বড়ো অংশ জুড়েও রয়েছে মৃত্যুর কথা। আপনার মৃত্যু-চেতনা বহমান স্রোতের মতো চলে। এই ভাবনার শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও বিবর্তন হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন?

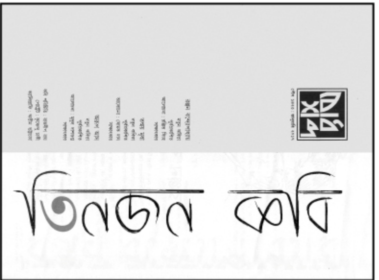




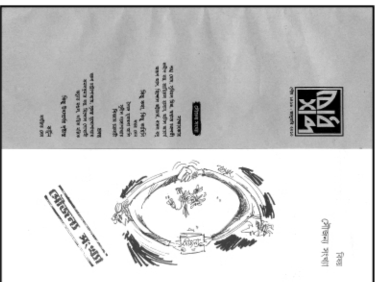
কবির প্রথম বই, জানুয়ারি ২০১১



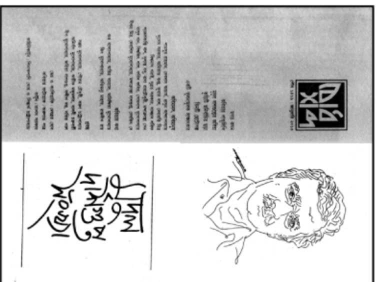
পাঁচজন কবি, জানুয়ারি ২০১৪



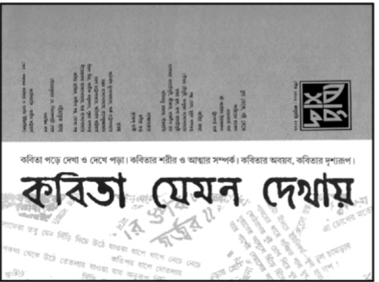
তিনজন কবি, জানুয়ারি ২০১৭



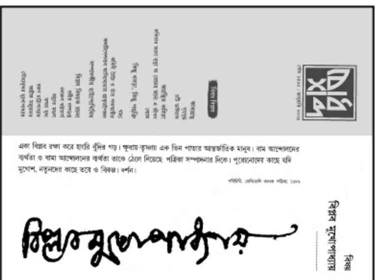
সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০



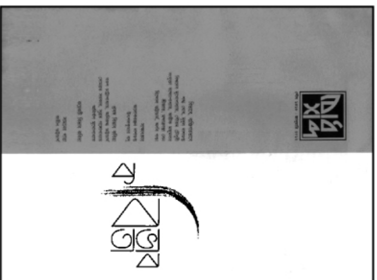
মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩



কবিতা যেমন দেখায়, জানুয়ারি ২০১৬



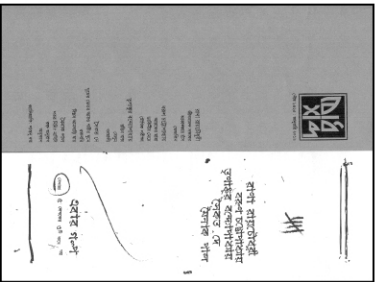
বিপ্লব মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০০৯



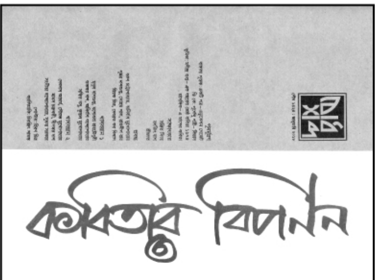
বিভাব কবিতা, জানুয়ারি ২০১২



ভেটকি, জানুয়ারি ২০১৫



এবার গল্প, জানুয়ারি ২০১৯



কবিতার বিপণন, জানুয়ারি ২০১৮

❑ নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে এবং অনেক, ভীষণভাবে বেঁকে গেছে, বাঁক নিয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে কী, যদিও প্রুস্ত বলেছিলেন যে, লেখক যখন লেখে তখন রাত জেগে অ্যাজ্‌মা নিয়ে এবং সব থেকে বড়ো ভয়, মৃত্যুভয় নিয়ে। আমি কখনওই সব থেকে বড়ো ভয় মানুষের মৃত্যুভয়, এরকমভাবে ভাবি না। যদিও সেটা, সেই ভয়টা একটা কষ্ট থেকে আসছে। কষ্টটা কী? এই যে জন্মালাম, এই যে মানুষের সঙ্গে দেখা হল, একশো বছর আগে কোথায় ছিলাম, একশো বছর পরে কোথায় থাকব, এই যে রহস্যটা এবং পৃথিবীটাকে মানুষের যে ভালো লেগে যাওয়াটা, সেইটার থেকে যে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, সে জন্য কষ্ট হয়। এইটা আমার অপরিণতমনস্কতারই কথা, কেননা, এইটা তো স্বাভাবিক খুব, যে জন্মিলে মরিতে হবে। তবু আমি প্রবলভাবে বাঁচতে চাইতাম। বেঁচে থাকতে চাইতাম। তারপরেও হয়তো মৃত্যুর কথা এসেছে। মৃত্যু সম্পর্কে গণ্ডগোলটা হয়েছিল একটা সময়ে, আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, আমি খুব তাড়াতাড়ি মারা যাব, নানারকম কারণে। আমার মনে হয়েছিল, আমার অনেক কিছু লেখার আছে। এখন যদি মারা যাই, তাহলে আমি লিখব কীভাবে? সেই দিক থেকেও মৃত্যুটাকে এড়িয়ে চলেছিলাম। এ নয় যে আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ঘুরেছি-ফিরেছি, তাহলে, সুইসাইড করতে গেছিলাম — সুইসাইডই করতাম। ফিরে এলাম কেন? সেখানে লেখার ব্যাপারও ছিল। লিখতে হবে, বাঁচতে হবে, জীবনটাকে জানতেও হবে। এখন যেটা আমার মনে হয়, এটা এতই সহজ, এবং মিলেও গেছে যে, আর জানায় না। শুধু একটা কথাই মনে হয় যে, কালকে যদি হঠাৎ মরে যাই, বাচ্চা মেয়েটার কী হবে?

অর্থাৎ বিচ্ছেদের যে যন্ত্রণা, এই যে সকলের মাঝখান থেকে হারিয়ে যাওয়া, ধরুন বার্গম্যানের *'সেভেন্থ সিল'*-এর সেই যে অভিনেতা, যে বলছে, আজকের রাত্তিরের এই শো-টা আমায় করতে দেওয়া হোক। তারপর দেখা যাবে।

❑ 'ঘুষ নাও না? তুমি কোনও ঘুষ নাও না? তুমি আজকের রাত্তিরটা ছেড়ে দাও।' আসলে, তার আগেই, সার্কাসের একটি ছুরি ছিল, তো মেয়েটির জন্য বুকে ছুরি মেরে এরকম করে আত্মহত্যার ভান করল। করে চলে গেল। এখন এই যে আত্মহত্যার ভান করে ট্রাম্প করতে গেল মৃত্যুকে, মৃত্যু এসে সেই ওভার ট্রাম্প করে গেল।

একটা সময় তো আপনার মনে হত যে, অনেক কিছু লেখার আছে...।

❑ হ্যাঁ সেটা ঠিক, কিন্তু তার তীব্রতাটা কমেছে। সেটা তো রোজই লেখার কথা, না? আমি যে জীবন সঞ্চয় করেছিলাম, সেটা তো লেখার জন্য। কিন্তু গত বছর কয়েক ধরে আমার যেটা হচ্ছে, লিখতে ইচ্ছে করছে না। আমি কখনও এমন সমস্যার মুখোমুখি হইনি। আমি সত্যি ভাগ্যবান, এই অর্থে বলতে চাই যে, যেদিন থেকে আমি লিখছি, কখনও লেখা আটকে গেছে, লিখতে পারছি না — এরকম আমার কখনও হয়নি। বিরানব্বই সালে একবার হয়েছিল, খুব ডিপ্রেশন হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল ওই ডিপ্রেশনের মূল কারণ বোধহয় এই লেখালিখি, আর তার থেকে প্রত্যাশা। তখন আমি ভেবেছিলাম আর লিখব না। এইভাবে আমি যখন তিনমাস-চারমাস-পাঁচমাস কাটালাম — দেখলাম, এবার করবটা কী? স্কুল যাচ্ছি, বাড়ি ফিরে আসছি। তা কী করব এবারে? বিরক্তিকর জীবন একটা। তখন আবার লিখতে শুরু করলাম। এই একমাত্র একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে মুখোমুখি হয়েছি যেটার, আমার কোথাও থেকে একটা না-লেখার ইচ্ছে মাথায় ঢুকেছে এবং সেখানে লেখাটা তো একদম অশ্লীল ব্যাপার। আমি তো লিখিওনি একদম। যখন মনে হয়েছে, দু-একটা লিখেছি।

আপনি মাঝে মাঝে খুব উজ্জ্বল পোশাক পরতেন। আপনি বলেও ছিলেন, মৃত্যুর বিরুদ্ধে এ আপনার প্রতিবাদ।

❑ হ্যাঁ, ঠিকই। আমি এখনও বলি সেটা এবং এখনও সেরকম পরি। ধরো, যে দু-জনের পোশাক সম্পর্কে একটা কিংবদন্তি আছে — মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এবং আমাদের কমলকুমার মজুমদার, এঁরা নাকি পোশাকে খুব টিপটপ ছিলেন আপাদমস্তক, যা নাকি দেখা যেত না। আমার ওরকম খুব কস্টলি, দামি জামাকাপড় কিনতে হবে, সেরকম না। আমি দেখতাম রংটা, রং আর প্রিন্টটা এবং আমি যেটা কল্পনা করে নিতাম, ওই জামাটা পরলে ব্যাপারটা কেমন হবে। সেজন্য সুব্রত (চক্রবর্তী) একবার ওর প্রিয় জিনিসের মধ্যে উল্লেখ করেছিল — ভাস্করের পোশাক!

আপনার লেখা পড়েও সব সময় মনে হয়েছে, একদম শেষ জায়গা থেকে একটা ঘুরে দাঁড়ানো। আপনার জীবনপ্রবাহ, অসুস্থতা — এসব থেকেই তো এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উঠে আসা।

❑ একটা সময় মানুষের জীবনের কতগুলো জিনিস — হয়তো ভেতরে-ভেতরে একটা প্রত্যাশা থাকে, আত্মপ্রতিষ্ঠা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা — আসলে কোনোদিনই আমার কোনো নিরাপত্তা ছিল না। আমি সেজদিকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। আমার লেখার অন্যতম প্রেরণা আমি ওঁর কাছ থেকে পেয়েছি। এরকম তার উপর নির্ভরতা, তবু আমি যে একদম বসে থেকেছি তা নয়, কিন্তু কোনও নিরাপত্তা ছিল না। এবং আমি যে চাকরিটা করি, সেটা একটা অদ্ভুত জায়গা। না গ্র্যাচুইটি আছে, না পেনশন। আমি ভেবেছি বাবা তো এরকমভাবে কাটিয়ে দিলেন, আমাদের সময় অনেক কিছু বদলাচ্ছে, বদলাবে। ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ যা জাঁতাকল...। আর একটা পরিষ্কার কথা, আমার মা একটু অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ মানে, তখন তো রাজনৈতিক গণ্ডগোলের একদম চূড়ান্ত, নকশাল, সি.পি.এম., কংগ্রেস — সব একাকার। তা মাকে দেখতাম বসে-বসে কাঁদছেন। আমি বলতাম 'কী ব্যাপার? কার ছেলেদের নিয়ে কাঁদছ?' আর মা-র ধারণা হয়েছিল, আমাদের পাশের বাড়িতে দু-টি অত্যন্ত ভালো ছেলে থাকে, ওরা পুলিশে খবর দিয়ে আমাদের দুই ভাইকে ধরিয়ে দেবে। সময়টা যখন চলে গেল, ওই সময়েই আমার গণ্ডগোলটা হয়েছিল। যখন আমি যেতাম বাসে-ট্রামে জানালার ধারে, তখন রাস্তার ধারে কত পাগল-টাগল দেখতাম, খালি গায়ে বসে আছে, নোংরা খাচ্ছে, নোংরা কাগজ কুড়োচ্ছে। আমার তখন এত টেনশন হত যে আমার মনে হত, আমি হয়তো একদিন এরকম হব। এটা, এতটা দুর্বলতা যে, এ কী, নিজের মনটাকে তো কন্ট্রোল করতে হবে, না? এটা তো লজ্জার অসুখ। ওদের দেখে আমার এরকম মনে হবে কেন? হয়তো মা-র অসুখটা কিছুটা প্রভাবিত করেছে।

একটা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার মতো...

❑ এটা আমি চেয়েওছিলাম, কাটিয়েওছিলাম। আসলে আমি হয়তো নিজেকেই বিপদে ফেলতে চেয়েছিলাম এবং নিজেকে আমি বিপদ থেকে টেনে তুলতে চেয়েছিলাম।

লেখার সঙ্গে-সঙ্গে কিছুটা নিরাপত্তাও অনেকে চেয়ে থাকেন। জীবনের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। আপনি যে চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নিলেন, খুব গভীর আর শক্ত খেলা...

❑ হ্যাঁ, খুব শক্ত খেলা। মানে, একটা ব্যাপার তো ছিল, যে, লিখব এবং আমি এইটা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি লিখতে পারব। এইটা কিছুটা আমায় সাহস দিয়েছিল। আমি সত্যি লিখতে পেরেছি কিনা আমি জানি না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, ভাবলাম তারপর যা হবার হবে। তো আমি যখন চাকরিগুলো করছি, দশটা থেকে পাঁচটা কোথাও বেরোতে পারছি না। তা আমি দেখলাম, এমন চাকরি করতে হবে, যাতে সময় থাকবে হাতে। তাই আমি এই মাস্টারি বেছে নিলাম একটা লোভে যে, ব্যক্তিগত সময়টা বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি পড়াশুনো করলাম না। পড়াশুনো করলে হয়তো আরও বেশি টাকা-পয়সা আসত। সুবিধা হত।

আরেকটা কথা ভাস্করদা, আপনি যে সমস্ত বান্ধবীদের হাত ধরে শীতের পাতা-ঝরা রাস্তায় হাঁটতেন, তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে..., তারা তো নিরাপত্তা চাইত —

❑ আমার সব থেকে বেশি বান্ধবী যে ছিল এবং তার সঙ্গে এখনও টেলিফোনে যোগাযোগ আছে, ধরো প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। আমি তো কখনওই বাস্তববাদী ছিলাম না। আমার এই যে বান্ধবী এখনও বান্ধবী রয়ে গেল, সেও তো বুঝেছিল যে, একে তো ঠিকমতো আটকানো যাবে না। কে.টি.-তে যাবে কি ওখানে যাবে, সে এইসব জানত। ফলে কোন বাঙালির মেয়ে ডেকে আনবে বাড়িতে! দু-নম্বর, আর একটি মেয়ে, সে খুব সুন্দরী ছিল। একদিন সেই মেয়েটার সঙ্গে বালি ব্রিজে

দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। বললাম, 'আমি হয়তো চাকরি-বাকরি ঠিক করতে পারব না।' সে বলল, 'বিয়েটা হোক না, তারপর দেখা যাবে, চাকরি করতে পারবে কিনা।' কথাটা আমার খুব ভালো লাগেনি। আমি বললাম যে, 'দেখো আমি কতগুলো জিনিস ফিল করি, আমি কবিতাটা লিখবই, হ্যাঁ। আর আমি এই সময়ে কীভাবে বিয়ে করি? আমার মনে হয় এটা ঠিক হচ্ছে না, আমাদের মেলামেশাটা।' তবে এটা ঠিক যে, কয়েকজন মেয়ে এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। কিন্তু আমি যে বন্ধুত্ব করিনি, তার সংখ্যা আরো বেশি।

'*প্রিয় সুব্রত*'-তে আমরা এক জায়গায় দেখছি আপনি লিখেছেন, '*আমি সেই অসুখ জামার মতো ব্যবহার করি।*' আপনি প্রয়োজনে তবে অসুখকে ব্যবহার করেন?

❑ আসলে সেই যে জামার মতো ব্যবহার করি, সেটা হচ্ছে, আই অ্যাম ক্যারিইং ইট। আমি এটা বহন করছি। আমি যতদিন বাঁচব, আমার অনেক ঝামেলা, অনেক গণ্ডগোল আমাকে বহন করতে হবে, আমি জানি। সেই জন্য আমি খুব ক্লান্ত হই না। অবসন্ন হই না।

'*শীতকাল...*'-এর ঠিক পরের কাব্যগ্রন্থ '*এসো, সুসংবাদ এসো*'। এখানে পাওয়া গেল বেশ কিছু কবিতা যা একেবারে গদ্যে লেখা।

❑ '*এসো, সুসংবাদ এসো*' যখন লিখছি, তখন দেখলাম যে, এরকমভাবে লেখাটা লিখতে চাইছি এবং এটা বেশ ভালো লাগছে। আমার মনে হয় এটা খুব ঝুঁকির কাজ। একদম যে সম্পূর্ণ গদ্য-আকারে কবিতা, আমাদের যে-কোনও পাঠক, আমরাও, আমিও পড়ব না। দেখেই একটা প্রতিক্রিয়া, একটা রিপালশন তৈরি হয়। তা সেটা একটা চ্যালেঞ্জের মতন। আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করলাম।

এটাকে আপনার চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়েছে। তাহলে আগে যেগুলো লেখা হয়েছে এই ফর্মে, আপনার কি মনে হয়নি, সেগুলো সফল হয়েছে?

❑ না, লিখেছিলেন, কয়েকজন লিখেছিলেন। কিন্তু শত সম্মান সত্ত্বেও, মানে এই লেখাগুলো অনেক আগের লেখা, লেখা হিসেবে ভালো। কিন্তু, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, এই কবিতাও যে মানুষকে টেনে নিতে পারে, ওই ক্ষেত্রে তেমন ঠিক হয়নি। উৎপলের (বসু) অসাধারণ কিছু ভূমিকা আছে। '*পুরী সিরিজ*'-এ আছে, তারপরেও লিখেছেন অনেক। কিন্তু আমি এই কুড়িটা কবিতা তখন লিখেছিলাম, পরে আর গদ্য-কবিতা বিশেষ লিখিনি। তা এখন এই গদ্য-কবিতাগুলো নিয়ে মজা আছে, একজন তরুণ সমালোচক লিখে ফেললেন, এ আর কী এমন ব্যাপার, '*শীতকাল...*'-এর কবিতাগুলো গদ্যে করে দিলে তো একই হয়ে যায়। আর এত সহজ কবিতা, এ কি কবিতা হচ্ছে নাকি? এত সহজ কেন? তা এরকম যেমন একটা আলোচনা বেরোল, তেমনি আর একটা, সুজিত (সরকার) '*শোনপাংশু*'-তে লিখল যে, আর নতুনত্ব কিছু নেই, সেই একই জিনিস এবং '*শীতকাল...*'-এর মতোই দ্বিতীয় বই বেরোল। কিন্তু মজার লেগেছে আমার যেটা, দেখো, আমাদের কিছু নেই-নেই বলেও যা আছে, তার জন্য আমাদের নিজেদের গর্বিত লাগে খুব যে, শঙ্খবাবু, প্রণবেন্দুদা — এঁরা চিঠি লিখেছিলেন সুজিতকে, '*শোনপাংশু*'-তে।

সেই সময় একটা আলোড়ন হয়েছিল এই ফর্মটা নিয়ে। '*এসো, সুসংবাদ এসো*' বেরোনোর পর এটা বাংলা কবিতার যেন একটা রীতি হয়ে গেল। তার আগে কিন্তু এত বেশি চল ছিল না!

❑ একটা মজার কথা বলি, আমার এক তরুণ বন্ধু আমাকে একটা চিঠি লিখলেন, 'ভাস্করদা, চারিদিকে, যখনই কোনো নতুন পত্রিকা খুলি, দেখি এই গদ্যে লেখা সব কবিতা। এত গদ্যের কবিতা, এরকম গদ্যে লেখা হচ্ছে কেন জানেন?' আমি তাকে চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম। জানিয়েছিলাম যে, 'হ্যাঁ, আমি জানি, কেন এত এই ধরনের কবিতা গদ্যে লেখা হচ্ছে। আমি জানি, কিন্তু বলব না!'

সমালোচকরা কি আপনার এভাবে লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন?

❑ না, এখানে জয়ও (গোস্বামী) একটু ভুল করেছিল। আমি ওই কুড়িটা গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে সত্যিই চেয়েছিলাম যে, যদি অক্ষরবৃত্ত আসেও, তাকে তাড়িয়ে দেব। একদম শুধু গদ্যের ওপর, সেই স্পন্দনটুকু নির্ভর করে লিখব। এই যে, কোনও মাত্রা নেই, আমার যা খুশি আমি লিখতে পারছি — এইটাই আমার কাছে সব থেকে শক্ত মনে হয়েছিল। জয় ওই গদ্য কবিতাগুলোর মধ্যেও যে অক্ষরবৃত্ত, মানে এর মধ্যে যে ছন্দ আছে, সেটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল।

'*লিপিকা*'-র লেখাগুলোকে আপনার কী মনে হয়?

❑ '*লিপিকা*' তো আমার অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল। আমি '*লিপিকা*'-র কথা বলতে যাচ্ছিলাম এই সূত্রেই। আমার মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথও এগুলোকে কবিতা বলতে ততটা সাহস পাননি, একটু দ্বিধা ছিল হয়তো তাঁরও।

একেবারে '*শীতকাল...*' থেকেই 'ঈশ্বর' শব্দটি আমরা পাচ্ছি। আপনার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ '*দেবতার সঙ্গে*'। দেবতার সঙ্গে এই সহবাস প্রথম থেকে কীভাবে আপনার মধ্যে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থে এসে পৌঁছল?

❑ দেখো এটা ঠিক যে '*শীতকাল...*'-এর প্রথম পাতাতেই 'ঈশ্বর' শব্দটা আছে এবং হয়তো আর একটা জায়গায় আছে। কিন্তু এটা ঠিক কীভাবে চলে এসেছে জানি না। লোকে যেভাবে ঈশ্বর ভাবে, সেভাবে 'ঈশ্বর'-টা আমার ঠিক আসেনি। হয়তো এমন জায়গায় বলেছি যে মনে হয়ে গেছে, হ্যাঁ সেটা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।

ধরো, একাত্তর সালে '*শীতকাল...*' বেরিয়েছে। তারপর '*এসো, সুসংবাদ এসো*'-র স্ক্রিপ্ট, '*রাস্তায় আবার*'-এর স্ক্রিপ্ট, কী করব? কে ছাপাবে? চাকরিও হল না, প্রেমও হল না। এতগুলো 'না' নিয়ে আমি কী করব! তা আমার ভালো লাগল না। একটু অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তো সেই সময়টা, আমার মনে আছে বিরাশি সাল, ওই বিরাশি সালে আমি যত কবিতা লিখেছি, আমি আর কোনোদিন, কোনো বছর, অত কবিতা লিখতে পারিনি। প্রায় স্বপ্ন বিরাশি সালটা। এর মধ্যে সেই সময় একদিন আমাদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। আমার শার্ট-প্যান্টগুলো পর্যন্ত গেল। তবুও সে সময় আমার দিব্যি চলে যেত। ভেতর থেকে এত আনন্দের মধ্যে ছিলাম, এমনকী নিঃসঙ্গও মনে হত না। টাকা-পয়সা নেই, প্রেমিকা নেই, বান্ধবী নেই, এরকম চলছে। কিন্তু এত ভালো ছিলাম। কেন ভালো ছিলাম, সেটা বুঝেছি। তখন আসলে, আরেকটা 'আমি' অর্থাৎ 'দ্বিতীয় আমি' — তার সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। সে আমাকে অনেক কিছু বলত। এই যে ঈশ্বরের ব্যাপারটা, সেটা এখান থেকেই এসেছে। চিনি-চিনি, অথচ চিনি না। এটা মনে রাখা ভালো, ঈশ্বর বলতে আমি দেবতাই বলেছি, কখনও ঈশ্বর বলিনি। কারণ, দেবতা এবং ঈশ্বরের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে, আমার মনে হয়। আমার তো সাহস নেই আরও কথা বলার, যেসব কথা বলতে চাই। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, ঈশ্বরকে আমাদের সাহিত্যে যেরকমভাবে দেখবে, সেরকমভাবে এখানে নেই। সে আমার বন্ধু, সে আমায় নিয়ে যাচ্ছে, সে ক্যারাটে করছে, সে বলছে — এতটার সময় এসো, ঠিক সেরকমভাবেই ভাবছিলাম। পরে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এটা কোনও অসুখ না।

এবার আমরা একটু অন্যদিকে যাচ্ছি। '*শয়নযান*'-এ এক জায়গায় আপনি বলছেন, '*রবীন্দ্রনাথকে, ছেলেবেলায় কোনো ভুল কারণে মনে হত, শুধুই প্রণয়কাব্যের কবি। রবীন্দ্রনাথ যে একাই একটা সুন্দর জাগরণ...*'। আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার চিন্তার একটি সম্পূর্ণ দলিল রাখতে চাই।

❑ তিনি এত বিশাল মাপের একজন কবি এবং গদ্যকার, নাট্যকার, শিক্ষাবিদ — উনি কী নন! সব থেকে উল্লেখযোগ্য ওঁর গানের ব্যাপার। ওই কথা, ওই সুর — ভাবা যায় না! তাঁর বিশালতা আমাকে উদ্দীপিত করেছে। সেই জন্য আমার মনে হয়েছে, আমি বারবার ডাকছি, আকর্ষণ করতে চাইছি, কিন্তু তিনি লিখেই চলেছেন, শিলং-এর চিঠিগুলো লিখেই চলেছেন। আমার মনে হয় একসঙ্গে আমরা বেঁচে থাকলেও আমি ছুঁতে পারতাম না কি আমি কথা বললে তিনি শুনতে পেতেন না। এটাও অনেকে একটা জায়গায় মিস্‌রিড করে, '*আসে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, নতুন ব্লেড দিয়ে আমি দাড়ি কামাই আবার।*' আসলে, এটার রবীন্দ্রনাথের দাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আমার নিজের একটু পবিত্র থাকা, পরিষ্কার থাকা। এটা পূর্ণেন্দু পত্রী এরকমভাবে ভেবেছিলেন, তা আমি ওঁকে চিঠিও লিখেছিলাম।

আর প্রণয়কাব্যের কবি কেন মনে হত, আমি যখন কলেজে ঢুকেছি, তখন নিজেরই প্রণয় নিয়ে এত ভাবতে ভালো লাগত যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ওটাই খুঁজতাম। কিন্তু সেটা মূর্খের মতো পড়া। তাছাড়াও এখন দেখো, আমার ছেলেবেলায় আমি যা পড়েছি, ধরো ছোটোগল্পগুলো আমায় ভীষণ টানত। বুড়ো বয়সে যখন *'কাবুলিওয়ালা'* পড়াচ্ছি ছাত্রদের, গলাটা একটু শেষের দিকে ভারীই হয়ে আসছে, এটা কী করে লুকোব সেটাই ভাবছি। তাহলে এত বুড়ো বয়সেও এটা ঘটছে। তারপর গান, আমাদের বাড়িতে গানের চর্চা ছিল, সব দিদিরা গাইতেন, আমিও গান গাইতাম। তারপর উপন্যাসগুলো সব পড়া, ওই বয়সে *'শেষের কবিতা'* ভালো লাগা, তারপর *'গোরা'* ভালো লাগা, *'চতুরঙ্গ'* ভালো লাগা। আর *'ডাকঘর'*! *'ডাকঘর'* তো তুলনাহীন। *'ডাকঘর'*-কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে মনে হয়। যদিও অনেকে শুনলে আমাকে ধমক দেয় যে *'রক্তকরবী'* কেন নয়? *'রক্তকরবী'*-ও খুব ভালো নাটক। কিন্তু *'ডাকঘর'*, আমার মতে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটক। এইসব মিলিয়েই রবীন্দ্রনাথ। আমার এটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের শেষ ঋষি এবং প্রথম কবি।

রবীন্দ্রনাথের গান — গানের বিষয়ে আপনার থেকে জানতে চাই।

❑ আমাদের বাড়িতে তো রবীন্দ্রসংগীতই হত। রবীন্দ্রনাথই হত। আমার বড়দির বাড়িতে, উত্তরবাংলায়, ওখানে গেলে দেখবে, একটা সময়ে বোধহয় রবীন্দ্রনাথের থেকেও বেশি চর্চা ছিল নজরুলের গানের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে খুব মজার-মজার ব্যাপার আছে, আমার নিজের। ধরো, কলেজ জীবনে যেগুলো, *'এসো আমার ঘরে এসো'*, *'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন'* — এই যে ভালোলাগা গানগুলো, যেগুলো শুরু হয়েছিল, সেইসব গানের রেশটাও আছে। কিন্তু এখন গান শুনতে শুনতে একটা অন্য অনুভূতি... সেই ছোঁয়া যায় না যে গান... এত উঁচু জায়গার যে গান! সেইগুলো হয়তো সেই সময় শুনলে ভালো লাগত না। যেমন ধরো, *'আনন্দ তুমি স্বামী'*, কিংবা *'এ পরবাসে'* বা *'কিছুই তো হল না,'* *'চলিয়াছে গৃহপানে'* — এই যে গানগুলো...। আমি একসময় তো প্রায় হাজার খানেক গান জানতাম। তা রবীন্দ্রনাথের গান তো আমাদের মানসিকতা, রুচি, আমাদের বোধ — এগুলো সব গড়ে দেয়।

আমরা একটু এগিয়ে আসছি। আজকের যে বাংলা গান — ব্যান্ডই বলি বা দলের গান এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায়, এই পুরো বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখছেন?

❑ গৌতমের কোনো তুলনা নেই। গৌতম চট্টোপাধ্যায় আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু এবং ওর মধ্যে যে বোধ আমি দেখেছি, পাশ্চাত্য সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, বাংলা গান মিশিয়ে দেওয়া — সে যে কী সুন্দর! সত্যি, সময়ের একটু বেশি তাড়াতাড়ি ওর গানগুলো এসেছিল। এরকম হয়। লোকে জানলই না গৌতমকে। লোকে বুঝলই না। এমনকী, সাধারণ মানুষ জানল না, বুঝল না, তাতে কিছু দুঃখ হয় না। কিন্তু যখন নমস্য ব্যক্তিরা কোনো পত্রিকা বার করেন, গানের পত্রিকা, তখন খুঁজে দেখি সকলেই রয়েছে, শুধু গৌতমই নেই। আমি তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা উজ্জ্বল অনুপস্থিতি...'। ওঁদের তো উত্তর নেই। আমার 'চন্দ্রবিন্দু'-র কিছু গান, বিশেষত কলকাতার উত্তর দিকে থাকার ফলেই হয়তো, ওদের কতগুলো অ্যাপ্রোচ ভালো লেগেছিল। কিন্তু এই 'দোহার'! আমি আপাতত 'দোহার'-এ মুগ্ধ হয়ে আছি।

কিন্তু ভাস্করদা 'চন্দ্রবিন্দু' বাদে প্রায় বেশিরভাগ ব্যান্ডেরই এই যে একটা লাফালাফি, একটু বেশি বাজনা, কথাটা পুরো শোনা যাচ্ছে না হয়তো, এটা কি বাংলা ভাষার সঙ্গে খুব খাপ খায়?

❑ না খাপ খাচ্ছে না, ঠিক মিলছে না ব্যাপারগুলো। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এরকম হচ্ছে না তো, আমাদের বয়সী যারা, তাদের ভালো লাগছে না, কিন্তু বাচ্চাদের ভালো লাগছে। তুমি দেখবে, হয়তো পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে তুমি যেটা কল্পনা করতে পারতে না — একটা ছেলে যাচ্ছে, পিঠে একটা গিটার। দিব্যি চলেছে, কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই এবং অন্য লোকেরও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এই যে সমাজের

বোধশব্দ-র সপ্তম, অষ্টম এবং নবম প্রকাশের বিষয় ও লেখকসূচি :

উনিশশো নিরানব্বই-এর নভেম্বর থেকে দু-হাজার এক-এর অক্টোবর অবধি 'বোধ' নামে এই পত্রিকার ছ-টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। নাম পরিবর্তন করে 'বোধশব্দ' হয় সপ্তম সংখ্যা থেকে।

❑ **সপ্তম প্রকাশ (তৃতীয় বর্ষ; আশ্বিন ১৪০৯ : অক্টোবর ২০০২)**

অমুদ্রিত কবিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, নরেন্দ্র দেব, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, হুমায়ুন কবির, প্রমথনাথ বিশী, সমর সেন।

উত্তরপাড়া-ভদ্রকালী এলাকা থেকে প্রকাশিত হাতে-লেখা 'লেখা' পত্রিকার (১৯৩৮-৪২ খ্রি.) চতুর্থ বছরের সংকলনের কবিতাগুলির প্রথম মুদ্রণ হয় ওই সংখ্যায়। *'অতীতের ভবিষ্যৎ : একটি হাতে বদলের বৃত্তান্ত'* শিরোনামে ভূমিকা লেখেন বরুণ চট্টোপাধ্যায়।

ভাষান্তর : ক্যাথলিন ওয়েস্টের কবিতা (অনু. শঙ্খ ঘোষ), মিমি খলভাতির কবিতা (অনু. ঋত্বিক মল্লিক)।

সাম্প্রতিক কবিতা : বিনয় মজুমদার, দেবারতি মিত্র, সুমন গুণ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সার্থক রায়চৌধুরী, সৌম্য চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ পাল, জয়িতা দাশগুপ্ত, পল্লব চক্রবর্তী, রাজদীপ ঘোষ, অরিন্দম রায়, অরুণকুমার মান্ডি, অতীন ভট্টাচার্য, রণিত চক্রবর্তী, অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্নাত চৌধুরী।

❑ **অষ্টম প্রকাশ (চতুর্থ বর্ষ; বৈশাখ ১৪১০ : মে ২০০৩)**

সাক্ষাৎকার : সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় (সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মৌ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক মল্লিক ও সুস্নাত চৌধুরী)।

কবিতা : শম্ভু রক্ষিত, মৃদুল দাশগুপ্ত, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ময় মৃধা, জয়িতা দাশগুপ্ত, অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, স্বাগতা গুপ্ত, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী সরকার, শৈবাল সরকার, রমা ঘোষ, সুস্নাত চৌধুরী।

গল্প : অনির্বাণ ভট্টাচার্য, রণিত চক্রবর্তী • **নিবন্ধ :** হজরত ইনায়ত খাঁ—*সুফি কবিতার রূপকল্প* (অনু. রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ব্যক্তিগত গদ্য : সোমক দাস।

❑ **নবম প্রকাশ (পঞ্চম বর্ষ; পৌষ ১৪১০ : জানুয়ারি ২০০৪)**

অমুদ্রিত চিঠিপত্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী।

অমুদ্রিত নিবন্ধ : প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডা. প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

অমুদ্রিত ছোটোগল্প : প্রভাতকিরণ বসু, জ্যোতির্ময় রায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

উত্তরপাড়া-ভদ্রকালী এলাকা থেকে প্রকাশিত হাতে-লেখা 'লেখা' পত্রিকার (১৯৩৮-৪২ খ্রি.) চতুর্থ বছরের সংকলনের নির্বাচিত গদ্যাংশের প্রথম মুদ্রণ হয় ওই সংখ্যায়। *'প্রচ্ছন্ন ভূমিকা অথবা ছদ্মবেশী সুপারনোভা'* শিরোনামে ভূমিকা লেখেন বরুণ চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, গীতা চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মাজি, অমিতাভ গুপ্ত, মৃদুল দাশগুপ্ত, রণজিৎ দাশ, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল সরকার, যশোধরা রায়চৌধুরী, জয়িতা দাশগুপ্ত, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমব্রত সরকার, তারেক কাজী, রাজদীপ রায়, সুস্নাত চৌধুরী, ঋত্বিক মল্লিক, বিশ্বজিৎ পাল, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, অভিমন্যু মাহাত • **সাক্ষাৎকার :** সরোদিয়া বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • **গ্রন্থালোচনা :** *মেধাবী নির্জন, বাকি কথা পরে হবে।*

বদলে যাওয়া, এইটা আমার মনে হয় ভেতর-ভেতর চাইছিল। কিন্তু *'বিশ শতক'*-এ — আমি একটা জায়গায় লিখেছিলাম, আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে বড়ো ভাঁওতা হচ্ছে একুশ শতক। সকলে বলছে একুশ শতক আসছে, 'মিলেনিয়াম' আসছে। তা, আমার মনে হল, একুশ শতাব্দী এলে কি আমাদের জীবন পালটে যাবে, ঘি-দুধে সাঁতার দেব? সেরকম তো হল না কই।

রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিয়ে বলছি, একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে — কবিতায় সুর দিয়ে গান। আপনি কি মনে করেন এভাবে দুটো পৃথক ফর্মকে মিশিয়ে দেওয়া যায়?

❑ এটা রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন, এটা জানি। অনেকে মাথার পাশে *'গীতবিতান'* রাখত শুধু পড়ার জন্য। কিন্তু এখনকার কবিতাকে গান করা কতটা সফল হয়েছে, আমি জানি না। আমার মনে হয় না সফল হয়েছে। যেমন ধরো, 'বেনীমাধব' — এইটা আমি জানি না, গানটা আমি শুনিনি কেমন গান হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই 'শোলক-বলা কাজলা দিদি'-র মতো হয়নি।

আপনার লেখায় আবার ফিরে আসি। সত্তরের সময় যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তখন আপনি লিখছেন, *'রাস্তায় আবার'* এবং *'এসো, সুসংবাদ এসো'*। কিন্তু এখানে সেভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়েনি বলে মনে হয়। আপনি কি তবে ওই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন?

❑ আমার মনে হয়, যারা এ ধরনের কথা বলবে, তাদের একটু মিস্‌রিডিং হয়েছে। এখন ঠিকই, বাইরে থেকে এরকম সহজ লাগে। কিন্তু ছায়া তো অনেক ভেতরেও চলে যায়, ভেতরের দিকেও টেনে নিয়ে যায়। মনে রেখো যে, *'এসো, সুসংবাদ এসো'* উনিশশো বাহাত্তর থেকে আটাত্তর সালের মধ্যে লেখা। *'রাস্তায় আবার'* উনিশশো বাহাত্তর থেকে আশি সাল। এই একই সময়ের দুটো বই প্রায়। যেখানে এমারজেন্সি হয়েছে, নকশাল নিধন হয়েছে, মানে কত কী! আমি একটা সময়ে ভাবতাম, কেউ যদি আমাকে বলে, কী মশাই, আপনার লেখায় রাজনৈতিক কবিতা কোথায় — তাহলে তো আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব বোবার মতো। কিন্তু রাজনৈতিক কবিতা কাকে বলবে? *'এসো, সুসংবাদ এসো'*-তে *'তাহলে শুরু করছি আবার স্রেফ নমস্তে জানিয়ে।'* — এখানে 'নমস্তে' শব্দটা। তবে এসব বলা ভালো কি? যেমন, *'রাস্তায় আবার'*-এ *'আমাদের নাটক'* বলে একটা কবিতা আছে। সেখানে দেখবে ওই বিচ্ছিন্নতা, বিষন্নতা গভীরভাবে লুকিয়ে রাখা, আড়াল করা। সেলান (পাউল সেলান) বলেছিলেন, আমার সমস্ত কবিতা বোতলে ভর্তি, ভেসে যাচ্ছে। এটা কেউ কুড়িয়েও পেতে পারে, আবার হারিয়েও যেতে পারে। তা সে আমারও আছে এরকম, এই সময়টা আমার উপরও ভীষণ ছাপ ফেলেছে। যার ফলে আমার স্নায়ুটাও পুড়ে গেছে ওই সময়ে, আমার মনে হয়।

***'স্বপ্ন দেখার মহড়া'*-য় বেশ কিছু নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন দে মশাই, শ্যামল দত্ত, সোমদেব ভট্ট, সেন মশাই, হেমবাবু, গুপ্তদা, ম্যাডাম চক্রবর্তী ইত্যাদি। এই নামগুলো কীভাবে এমন অব্যর্থ হয়ে উঠল যে, আপনার লেখায় জায়গা করে নিল?**

❑ যে নামগুলো ব্যবহার করেছি এবং যেভাবে করেছি, সেটা মনে হচ্ছিল যে নতুন কোনো কিছু পথ দেখাবে, নতুন ধরনের কিছু মনে হবে। যেমন আমি লিখেছিলাম *'শ্রী শ্রী হ্যামলেট আসবে'*। যে নামগুলো এসেছে, যেভাবে এবং যে প্রসঙ্গে এসেছে, সেখানে আসছেই এই নামগুলো। এর জন্য আমি কোনও কিছুই ভাবি না। কিন্তু, যেটা আমি ভেতরে-ভেতরে আনন্দ পেয়েছিলাম, তখন তো আমাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে, তখন ছেলেবেলার স্কুল-জীবন, কলেজজীবন, মাস্টারমশাইদের কথা মনে পড়ে। এই 'মাস্টারমশাই' শব্দটা *'স্বপ্ন দেখার মহড়া'*-তে বারবার এসেছে। এগুলো অবশ্য আমি বললাম বলে তোমরা এখন এরকমভাবে নেবে। যে জানে না, সে অন্যরকমভাবে নেবে হয়তো। তাই না? মজার খেলা খুব আর কী!

***'স্বপ্ন দেখার মহড়া'*-তে *'রাত্রিসংগীত'* কবিতায় আপনি একটি উপন্যাসের কথা বলেছেন, যার প্রধান চরিত্রে থাকবে একটি কঙ্কাল। আবার *'শয়নযান'* -এও এই উপন্যাসের কথা রয়েছে। এই চিন্তা কীভাবে আপনার ভেতর বারেবারে এসেছে?**

❑ আমার মনে হয় যে, উপন্যাস লেখা হলে এরকমভাবেই লেখা উচিত। মানে, ঠিক জায়গায় বুলেটটা লাগা উচিত। 'বুলস্ আই' যাকে বলে। ভালো, মহৎ উপন্যাস যাকে বলি আমরা, সেই দিক থেকে সেরকম খুব কম পাই। কমলদা একমাত্র আমাদের সাধ পূরণ করেন। জীবনানন্দের গদ্য আর ছোটোগল্পের ভাণ্ডার তো আমাদের পূর্ণ হয়ে রয়েছে। শুধু ইদানীং দেখা যাচ্ছে কয়েকজন, 'ছোটোগল্প পড়ুন' বলে আন্দোলন করছেন, পদযাত্রা করছেন। পদযাত্রাটা হচ্ছে কেন? ছোটোগল্প তো এরকম ছিল না — 'ছোটোগল্প পড়ুন' বলতে হবে?

***'নীল রঙের গ্রহ'* — রচনাকাল চৌষট্টি থেকে আটানব্বই, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে কেন বিন্যস্ত করলেন না? কেন এই পৃথক কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজন হল?**

❑ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা ঠিকই। আমি বিন্যাস করিনি, রেখে দিয়েছিলাম। আমার একটা প্রচেষ্টা ছিল যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে রেখাটা আমি টানতে চেয়েছিলাম, যে রং দিয়ে, সেটা কি ঠিক হয়েছে? টানতে পেরেছি কি? না, কোথাও বেঁকে গেল? পুরোনো লেখার সঙ্গে এই যে *'নীল রঙের গ্রহ'*-র কবিতাগুলো পড়ে কি বোঝা যায়, ওগুলো আমার কবিতা, না অন্য কবিতা? আমি বোঝাতে গিয়েছিলাম এটা আমারই কবিতা এবং এ একটা বেশ আলাদা কথা বলছে। এরকম এতটা পিরিয়ড, এতটা লম্বা সময় লাগে। যেমন ধরো, একটা কথা বলছি, যেটা মৃদুল (দাশগুপ্ত) *'শতজলঝর্ণার ধ্বনি'*-র সময় সংকলন করল বাংলা কবিতার, তাতে ও যে কবিতাটা নিয়েছিল, সেটা তখনও কোনো বইতে ছিল না। তা সুব্রত একদিন, আমাকে ওই কবিতাটা পড়ে বলে, 'এটা কী করেছ ভাস্কর, এটা দাওনি কেন, *'শীতকাল...'*-এ? এ তো খুব অন্যায় করেছ।' আমি বললাম যে, 'না রেখে দিলাম। আসলে, থাকুক না চার-পাঁচটা এরকমভাবে ছড়ানো, অপ্রকাশিত কি অপরিবর্তিত, কেউ, যদি দরকার হয়, খুঁজে-খুঁজে নিয়ে পড়বে। যদি না দরকার হয়, পড়বে না।'

একটু অন্য বিষয়ে বলছি, আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা যখন বেরোল দে'জ থেকে আর আপনার কাব্যগ্রন্থগুলো যখন বেরিয়েছে — আমরা একটা বানানভেদ দেখতে পাই। যেমন 'দ্যায়' থেকে 'দেয়', 'গ্যালো' থেকে 'গেল' ইত্যাদি বিভিন্ন উদাহরণ দেওয়া যায়।

❑ দে'জ-এর বই বলে হয়নি, এটা আমিই চেয়েছিলাম আর কী। আমার ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল যে, এটা ওভার-লোডেড হয়ে যাচ্ছে। ছাপার যে জিনিসগুলো, বেশি হয়ে যাচ্ছে একটা পাতায়। এগুলো আমি চাইছি না। চেয়েছি, চেয়েছি, অল্প বয়সে চেয়েছি, আর ভাল্লাগ্‌ছে না এখন।

এবারে একটু অনুবাদের কথায় আসি। একসময় আপনি তাদেউশ রুজেভিচ অনুবাদ করেছিলেন। ওঁকে কেন নির্বাচন করলেন?

❑ হ্যাঁ, রুজেভিচ। তাঁর সমসাময়িক যে কবিরা রয়েছেন, যেমন ধরো নিকানোর পাররা কি মিরোস্লাভ হোলুব কি ভাসকো পোপা কি পোল্যান্ডেরই আরও কতজন রয়েছেন। তা, ওদের কবিতা যে ভালো লাগেনি, তা নয়। কিন্তু রুজেভিচের যে ব্যাপারটা, ওঁর সাফার, মানে ওঁরা দেখেছেন আগুনটা কোথায় জ্বলছে। দেখেছেন যে, একটা বাচ্চা মেয়ে; তাকে ন্যাড়া করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্যাস-চেম্বারে। এগুলোই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, আমার মনে হয়। এবং উনি বলেছিলেন ওই সমস্ত নান্দনিকতা নিয়ে, 'আমার কোনও সময় নেই। আই হ্যাভ্ নো টাইম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এসথেটিক্স' এবং মজার কথা হল যে, তখন একবার তরুণ কবিদের ভোট নেওয়া হল যে কাকে তোমাদের ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি, তখন দেখা গেল রুজেভিচকেই সবার ভালো লাগে সবচেয়ে। এবং ভদ্রলোক এখন একুশ-বাইশ বছর হল কবিতা লিখছেন না, নাটক নিয়েই রয়েছেন। রুজেভিচের একটা কবিতায় দেখছি, পৃথিবীটা কোনওদিনই শেষ হবে না, পৃথিবীটা কোনওদিনই ফুরিয়ে যাবে না। আর তাঁর লেখার কৌশল, লেখার বিষয়, লেখায় যে কথা বলছেন, তাঁর যুক্তি এবং এগুলো এতই, এতই যে, যে পড়বে আমার মনে হয়, তার ভালো না লেগে পারবে না। তা, আমারও ভালো লেগে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম যে, গুছিয়ে কাজ করা উচিত। কাজ করা উচিত মানে, অনুবাদ করা উচিত। তা,

আমি তো সেরকমভাবে, যাঁরা অনুবাদ করেন তাঁদের মতো অত দক্ষ নই। এই কষ্ট করে, একটু সময় নিয়ে, ঘষামাজা করেই করা। এছাড়া ধরো কার্লোস উইলিয়ামস্ অনুবাদ করেছিলাম। সে মজার কবিতা।

পাউল সেলানের কথাও আপনি একবার বলেছিলেন।

□ সেলানের লেখাও অসাধারণ। যেমন, এক জায়গায় বলছেন, মানুষের কবরে ফুল না দিয়ে ফুলটাকে কবরে দিয়ে মানুষটাকে দাঁড় করিয়ে রাখো। নোবেল পেতেন হয়তো, আর পারলেন না সহ্য করতে। পঞ্চাশ বছর বয়সে সুইসাইড করলেন। আমি অবশ্য এক ব্র্যাকেটে ওঁর সঙ্গে আমার নাম করতে চাই না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আমারও এরকম সময় গেছে, এরকম অর্থহীন মনে হয়েছে।

আপনার গদ্যের কথায় আসি। *'প্রিয় সুব্রত'* বইয়ে সুব্রত চক্রবর্তীকে সম্বোধন করে আপনি মূলত নিজের কথাই লিখেছেন। তাহলে *'শয়নযান'* আর *'প্রিয় সুব্রত'*-র মধ্যে অনুভূতিগত দিক থেকে পার্থক্য কোথায়?

□ আমি পার্থক্য করি কীভাবে, আমি জানি না। আমার দুটো আলাদা লেখাই মনে হয়। তবে আমার একজন অত্যন্ত প্রণম্য এবং আমি যাঁর কথা অত্যন্ত মেনে চলি এবং যাঁর মতামতকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিই, তিনিও বলেছেন, একদম আলাদা, তফাৎ আছে। এখন কথা হচ্ছে যে, সত্যি, আমি তো গদ্য লিখি না, আমি তো কবিতা লিখি। তেইশ বছর পরে, আমি গদ্যই যদি ফের লিখলাম, সেটা আমি কেন *'প্রিয় সুব্রত'*-র দ্বিতীয় এডিশন করতে যাব? যেটা হয়েছিল আমার, সেটা অনুভূতি যদি বল, তাহলে কবিতাতেও একই অনুভূতি তোমরা পাবে। এখন কী হয়, ভাষাটা আলাদা হয়ে যায়, অনুভূতিটা থাকবেই। তবে, এই সচেতনতা ছিল যে *'প্রিয় সুব্রত'*-র মতো যাতে না হয়। সেই সময়ের যে অনুভূতি, *'শয়নযান'*-এর অনুভূতি — অনেক জল গড়িয়ে গেছে।

ওই সময় ধরো, ছয়মাস অন্তর ন-হাজার টাকা করে আসছে। এবং তার শর্ত হচ্ছে আমাকে একটা কিছু প্রোডিউস করতে হবে। আমি ভাবি, যদি লেখা না-ই হল কিন্তু সিনিয়র স্কলারশিপটা যদি আবার পাই... যেমন একজন পেয়েছেন আমাদের, এটা এখন প্রায় দেড় লাখ টাকার মতো। *'শয়নযান'* হল পঞ্চাশ হাজারের কমে লেখা, দেড় লাখে লিখলে অনেক ভালো বই লিখতে পারতাম! অনেক মোটা, বেশ ক্ল্যাসিক একটা! এখন যারা পাচ্ছে, তারা দেড় লাখ পাচ্ছে।

এখন যারা কাজ করছে, তারা কেমন করছে?

□ তারা কী লিখছে, আমি জানি না। তাদের লেখা সম্পর্কে আমার আগ্রহ নেই এবং তাদের সম্পর্কেও আমার আগ্রহ নেই। কিন্তু কী হয় জানো, মাঝে মাঝে খুব ব্যর্থ লাগে যখন দেখি যে আমারই কোনো বন্ধু, পরিচিতজন, এরকম একজন এল, এসে বসে রইল, বলল, 'ভাস্কর, আমি এরকম একটা পরিকল্পনা করেছি, আপনার অনুমতি নিতে এলাম, প্রেমের কবিতা করেছি, সুনীলদা, শঙ্খবাবু, আপনি, রণজিৎ, জয়।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাতে ভাবনার কী আছে আমার?' বলে আমি বললাম যে, ''আচ্ছা, তুমি কি ওই লেখাটা নিয়েছ যে, *'মনে পড়ে, প্রেমিক ছিলাম'*। *'স্মৃতি'* কবিতাটা নিয়েছ? 'মুখ ঘুরোও, জাপানী অক্ষর', সেটা নিয়েছ?'' বলল, 'না ওটা আমি নিইনি।' অথচ এই কবিতা সম্পর্কে আমার খুবই দুর্বলতা ছিল। তা, আমার মনে হল, তিনি নিজেই করেছেন, ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলে নিলে, আমার পছন্দের-অপছন্দের জিনিস, কী ক্ষতি হত?

আমরা জানি, আপনি কমলকুমার মজুমদারের সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি *'প্রিয় সুব্রত'*-র প্রচ্ছদও এঁকে দিয়েছিলেন। আপনার স্মৃতি থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

□ আমি অসীম ভাগ্যবান যে, কী বলব, কমলদার মৃত্যুর আগে প্রায় বছর দশেক তাঁর কাছাকাছি থাকতে পেরেছি। আর এই সময়ে যা বলেছিলেন তা তো বলা যাবে না, তাহলে বলবে, ঢাক পেটাচ্ছে নিজের। তবে, ওরকম মানুষ, ওরকম জ্ঞান, ওরকম বুদ্ধি, ওরকম কথা, ওরকম রসিকতা, মানে, ভাবা যায় না। তাঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। একটা কথা আমি তোমাদের বলতে পারি, যেটা অনেকেই জানে না। সেটা হচ্ছে, কমলদা মারা যাবার ঠিক আগে, আমি কমলদার একটা চিঠি পাই যে, কমলদার শেষ ইচ্ছে ছিল, আমাদের যে বাংলার পুরোনো ক্ল্যাসিক, সেগুলোকে তিনি পুনর্মুদ্রণ করবেন। এখন চিঠিতে আমায় লিখছেন, 'তুমি যে কাজ করবে ছোকরা, ছোকরা শোনো...'। এরপর আড্ডা হচ্ছে ইন্দ্রদার দোকানে কলেজস্ট্রিটে, ''তুমি যেটা করবে, তোমার নিজের হাতের লেখায় তুমি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'রসালো কথা'*-টা লিখবে, এটা আমি প্রথমে ছাপাব।'' এদিক থেকে ইন্দ্রদা বারবার বলত, 'কমলদা, এটা কী করছেন? আপনি ভাস্করকে খামোখা ব্যস্ত করছেন কেন? আমি আপনাকে রচনাবলিটা দিচ্ছি, আপনি নিয়ে নিন।' তা তখন কমলদা বললেন, 'ভাস্কর, তুমি পুরো ম্যানুস্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেবে আমায়, নিজের হাতে লিখে।' আমি তো বুঝতে পারছি না, কী ব্যাপার রে বাবা, আর উনি যা বলবেন, তা তো করতেই হবে। যাইহোক, আমি করতে বসলাম এবং করতে বসে দেখলাম, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'রসালো কথা'* — এরকম লেখা আমি জীবনে পড়িনি। কী অসাধারণ লেখা! আমার মনে হয় যেটা, কমলদা হয়তো আমার এ বিষয়ে কিছুটা অভাব দেখেছিলেন। মানে, আমাদের পুরোনো বাংলা। আর একটা কথা, যেটা কমলদা সম্পর্কে না বললেই নয়। একবার রবি ঘোষ গিয়ে সত্যজিৎ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আপনি এখনকার নাটক দেখেন? কার নাটক আপনার ভালো লাগে?' তখন সত্যজিৎ রায় বললেন, 'কমলবাবু কি নাটক করছেন? কমলবাবু যদি নাটক করেন, তাহলে ধারে-কাছে কারো থাকার কথা না।' এই আমাদের যারা এখানে বিখ্যাত গ্রুপ, তারা এর ধারে-কাছে কখনো ভাবতে পারেনি। এদের মিলিত কল্পনাশক্তিও যদি কাজ করে, তা-ও হতে পারবে না। কেন না, এই যে মানে জ্যামিতি, ডায়াস-এর এ ওখান দিয়ে চলে গেলে, তখন ও এখান দিয়ে এল। এবং ব্যালের মতো করে — আর সব বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে তো...

ভাস্করদা, একটা কথা, আপনি সেই অর্থে ছোটোগল্প, উপন্যাস লিখলেন না কেন?

□ কবিতা লিখি, আমি খামোখা উপন্যাস লিখব কেন? এরকম আমার ছেলেবেলা থেকে মনে হয়েছিল যে, কবিতাই লিখব। উপন্যাস লিখব না, কি ছোটোগল্প লিখব না, এটা মনে হত। কিন্তু, এখন মনে হয় ভাবনাটা ভুল, ঠিক হয়নি। যখন সময় রয়েছে, তখন দুটো-একটা উপন্যাস না হয় লিখলামই, কী হয়েছে। হ্যাঁ, খারাপ কী!

'শয়নযান'*-এ আপনি একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, *'গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের বাংলা কবিতাকে এখনই কেন মনে হবে উনিশ শতকের? কেন মনে হবে, শুধুই প্রতিভার

***প্রদর্শনী?'* অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি আপনি পঞ্চাশের কথা বলছেন। বিষয়টা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।**

❑ কিছুটা তো সত্যিই, পঞ্চাশের তো, তাদের আরম্ভটা কয়েকজনের যদি দেখা যায়, তাঁরা যেভাবে লেখা শুরু করেছিলেন, যা যা বিরোধিতা করেছিলেন, পরবর্তীকালে কয়েকজন ছাড়া অন্য সবাই সেটা মেনে নিয়েছিলেন। এবং এগুলোর ফলে লেখালেখির ওপরে প্রভাব এসে পড়েছে। আমার এখনও মনে হয় যেন একটা পরিষ্কার ভালোবাসার মন, একটা বড়ো মন, অপরের আনন্দ দেখে চোখে জল এসে পড়ছে কি অপরের কষ্ট-দুঃখ দেখে চোখের জল এসে পড়ছে — এরকম, কবিদের এরকম হয়, আমার মনে হয়। তা, কথাটা হয়তো একটু বাড়িয়েই বলেছিলাম। কিন্তু কথাটা একদম মিথ্যে নয়। আমার এরকম এখনও মনে হয়। এবং মনে হয় না যে, *হঠাৎ* পালটে যাবে মতটা।

মানে, আপনি বলতে চাইছেন দু-তিন জনের লেখা বাদ দিয়ে, আর যাদের লেখা, তাদের স্কুলিং, তাদের স্টাইল — এগুলো যথেষ্টই অনাধুনিক।

❑ না, অনাধুনিক বলছি না। উনিশ শতকের বলছি ঠিকই, মানে বাতিল হয়ে গেছে যেসব। যাঁরা লিখছেন এবং লিখে যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমার মনে হয় না, তাঁরা যেরকমভাবে আরম্ভ করেছিলেন এবং মধ্যবয়সে যেরকম কবিতা লিখেছিলেন, শেষ সময় পর্যন্ত তাঁরা সেরকম লিখে যেতে পেরেছেন। দু-তিনজন ছাড়া আর কেউ পারেননি সেরকম। যেমন ধরো, শঙ্খবাবুর কবিতা আমরা দেখি না প্রায়। কিন্তু যখন দেখি, তখন কিন্তু মনে হয় যে এটা উনিই লিখছেন এবং কোনও কবিতা, আর-একটা কবিতা লিখবেন বলে লেখেননি।

বিনয় মজুমদারকে আপনি কীভাবে দেখেন?

❑ বিনয় অত্যন্ত ভালো কবি, বড়ো কবি। কিন্তু আমার অনেকের সঙ্গে যে জায়গাটা মেলে না, গণ্ডগোল হয়, আমি বলে দিচ্ছি পরিষ্কার যে, বিনয়দার *'ফিরে এসো, চাকা'*-র কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু, যে একজন সম্পূর্ণ কবি, তাকে তো সুস্থও থাকতে হবে। একজন কবি যখন সারাজীবন লিখবে, তখন তাকে সুস্থও থাকতে হবে। এটা তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব। তা তিনি থাকতে পারলেন না, কিন্তু সেটা সত্যিই দুঃখের। তারপর তিনি একটা সময় যখন আবার লিখতে শুরু করলেন, সেগুলো আমার নিজের ভালো লাগেনি। অনেকে শুনলে হয়তো রেগে যাবেন, কিন্তু *'ফিরে এসো, চাকা'* ছাড়া বিনয়দার অন্য কোনো বই-এর ব্যাপারে আমি অতটা উচ্ছ্বসিত হব না।

অনেক জায়গায় আপনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, সেভাবে আপনি স্বীকৃতি পাননি। পরবর্তীকালে *'শয়নযান'*-এ আপনি বলেছেন, *'বিখ্যাত হতে চাওয়ার মধ্যে একটা অশ্লীলতা আছে।'*

❑ সে তো বটেই, সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু, কথা হচ্ছে যে, কিছু মজাও তো করতে হয়। মজার কথাও থাকে, আবার সিরিয়াস কথাও থাকে। এই যে, *'বিখ্যাত আর বিখ্যাত হতে চাওয়ার মধ্যে একটা অশ্লীলতা আছে'* — এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার সন্দেহ নেই কোনও এখনও, হ্যাঁ। একজন কবি সিনেমা-অভিনেতার মতন, সে যেখানে যাচ্ছে, ভিডিও তার সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছে, আর সই করছে, মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, পায়ে পড়ছে... এগুলো আমার মনে হয় যে, যিনি সহ্য করতে পারেন, পারেন এগুলো। আর না হলে এই যে 'ক্রাইসিস অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন' — এই সঙ্কটটা দেখা দেয়।

কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েশনের অন্য জায়গাটা, যেটা পাঠকের ভালোবাসা, এর মূল্যটা?

❑ এগুলোই তো আসল। যেমন সেদিন, এই সপ্তাহেরই প্রথম দিকে বোধহয়, এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল, যিনি আমাকে বললেন যে, "আমার বন্ধুদের বলি যে, এখনকার গদ্য যদি পড়তে হয় তো, *'শয়নযান'* পড়ো।" আমাকে সেই ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীভাবে কী লিখেছেন, বুঝতে পারছেন?' এটা কীভাবে সম্ভব হল? এখন কথা হচ্ছে যে, *'শয়নযান'*-এ একটা লাইন ছিল বোধহয়, যে, স্বীকৃতিটা দেবে কে?

তাহলে আপনি একটা আকাদেমি পুরস্কার কীভাবে গ্রহণ করবেন?

❑ দ্যাখো, আমি পেলাম কি পেলাম না, সেটা বড়ো কথা নয়।

নাকি, আপনি সন্ধেবেলায় আস্তে আস্তে গিয়ে সেই পুরস্কারটা গ্রহণ করবেন?

❑ সেগুলো আমি ঠিক বলতে পারছি না যে, কী হলে কী হবে। তবে টাকাটা আমার কাজে লাগবে। কেননা, আমার কাছে পয়সাকড়ি একদম নেই। একদমই নেই।

আপনি কি এখনও আশা করেন যে, মূল্যায়ন হবে?

❑ না না, মূল্যায়ন না হলে কী যায়-আসে আর? আমি মরে গেলে কে আমার ওপরে... জীবনানন্দের হচ্ছে এখন, তাতে তিনি যে জীবন কাটিয়েছিলেন, অসহ্যতার একটা আবহাওয়ার মধ্যে সেটা কি পালটে গেল?

কিন্তু ভাস্করদা মূল্যায়ন কি হয়ে যায়নি?

❑ আমাদের মূল্যায়ন কী, আমি জানি না। তবে, এইটা যদি কথা হয়, যেটা শঙ্খবাবু বলেছিলেন যে, একসময় সুধীন দত্তের যেভাবে খুঁজত, বাঙালি পাঠকরা ভাস্কর চক্রবর্তীর বই সেভাবে খুঁজছে। এখন, সেই দিক থেকে একটা মূল্যায়ন হয়তো বা। তবে, কবিতা লেখাটা আমার জীবনে খুব কাজ দিয়েছিল। মানে, নাহলে তো আমি সত্যিই সারাজীবন অসুস্থ হয়ে পড়তাম। একটা জিনিস নিয়ে একদম জড়িয়ে থাকা রাতদিন, একটা ঘোরের মধ্যে থাকা, সেইটা আমায় কবিতা করিয়েছে।

আচ্ছা, আপনার কবিতা কোনো আবৃত্তিকার আবৃত্তি করছেন, সেটা কেমন লাগবে আপনার?

❑ একদমই না। আমার কবিতা আমি পড়ছি, শুধু আমার দায়িত্বটা কী, আমার দায়িত্ব কবিতার যে বিষয়টা আছে, সেটা তোমার কাছে তুলে দেওয়া যে, কমিউনিকেট করছে কিনা। যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। আবৃত্তিকাররা তো গলা কাঁপিয়ে, নামিয়ে, বেঁকিয়ে অনেক কিছু করবে। আবার নানারকম বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে, নানারকম বাজনা নিয়ে আবৃত্তি হবে। একটা মজার কথা বলি। আমাদের এই রবীন্দ্রসদনে শম্ভু মিত্র এবং অরুণ মিত্রের ব্যাপারটা তো বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু, একদিন টিভিতে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। তা কবি বলছেন যে, আচ্ছা, আপনারা যে কবিদের কবিতা পড়েন, তাঁদের কিছু রয়্যাল্‌টি দিলেই তো পারেন, রয়্যাল্‌টি দেন না কেন? আবৃত্তি-শিল্পী বলছেন, এটা একটা অন্য শিল্পমাধ্যম, আমরা এটাকে তৈরি করেছি, আমরা কেন কবিদের পয়সা দেব? তখন সেই কবি বলছেন, এক কাজ করুন না, আপনারা নিজেরাই কিছু লিখে নিন না। লিখে নিয়ে সেগুলো পড়ুন না!

পৃথক-পৃথকভাবে জানতে চাই, কবিতার সঙ্গে বাণিজ্যের এবং কবিতার সঙ্গে পুরস্কারের কী সম্পর্ক?

❑ একটা ভালো কবিতার সত্যিই বাণিজ্য হওয়া মুশকিল খুব, তাই না? এটা ওই বুদ্ধদেব বসুর হ্যেল্ডারলিন অনুবাদে, যেটা আমি আমার তরুণ বন্ধুদের বলতাম, *'হায়! যা হাটের পণ্য, তাই আজ জনতার প্রিয়'*। ভালো কবিতার সঙ্গে একটা কোথাও বিবাদ রয়েছে বাণিজ্যের। যেগুলো আজকাল পড়া হয় এবং যাদের ছাড়া কোনও কবি সম্মেলন সম্পূর্ণ হয় না, সেখানে কবিতা তো দূরের কথা, কবিতার নামগন্ধই নেই, দিব্যি গল্প চলে যাচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন আমাদের তো দুটো ট্র্যাডিশন, একটা ওপেন — যেগুলো হচ্ছে, দিল্লি, আমেরিকা, তাইওয়ান যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে, এর একটা ধারা হয়েছে। আর একটা সিক্রেট ট্র্যাডিশন, খুব গোপনে-গোপনে লিখতে ইচ্ছে করছে। যেটা, প্রত্যেক দেশেই হয়তো আছে, মানে, যেগুলো প্রাণশক্তি সমস্ত মুঠোতে ধরে রেখেছে। যেমন ধরো বিদেশে, কার কবিতা একবার নিষিদ্ধ, শুনেছিলাম, তখন ওরা কী করত, যারা কবিতা পড়ত, ওরা জেরক্স করত। জেরক্স করে গোপনে আবার অন্য আর একজনকে পাস করে দিত। সে পড়ে আবার অন্যজনকে পাস করে দিত। এরকমভাবে কবিতাটা ঘুরত। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কী, এমন একটা সময় এসেছে যে, যখন লোকে আর জানতেই চায় না প্রায় কিছু, ওই মিডিয়া যা বলছে, তাই মেনে নেয়।

নিজে আবিষ্কারের কোনও প্রবণতা নেই।

❑ নিজে আবিষ্কারের কোনও প্রবণতা নেই, নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা নেই, আত্মবিশ্বাস নেই।

এতক্ষণ তথাকথিত স্বীকৃতি, পুরস্কার, মূল্যায়ন এসবের কথা হল। আপনার নিজের, ব্যক্তিগতভাবে কী মনে হয় — যখন আপনি একটা কবিতা লিখছেন তখন তার থেকে কী স্যাটিসফ্যাকশন আশা করেন? কখন ঘটে সেটা?

❑ আমি আমার তরুণ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতাম যে, আচ্ছা, তোমরা যখন কবিতা লেখ, কি একটা ভালো কবিতা লিখেছ বলে মনে হয়, তোমাদের কি কোনও শারীরিক পরিবর্তন হয়? মানে শরীরের মধ্যে কোনও কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে, এরকম মনে হয়? কেননা, আমার হত একসময়। ভালো কবিতা লিখলে প্রবল উত্তেজিত হয়ে যেতাম। এটা আস্তে-আস্তে কমে গেছে। একটা কবিতা, ভালো একটা কবিতার আরম্ভটা পেলাম, সেটাই এত আনন্দের। সেটা যখন এগোচ্ছে আস্তে-আস্তে, এবং আমার বোধ-বুদ্ধি-বিবেচনায় এইটা মনে হচ্ছে যে একটা ভালো লেখা, লিখে ফেললাম, খুব আনন্দ দিত। সেইটা একটা সময় পর্যন্ত ছিল। এ আনন্দ — নিশ্চয়তা কি ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়েও অনেক বেশি। যেমন বড়োকর্তা, মানে ওই শচীন দেববর্মন, 'আঃ, বাঁশি শুনে আর...' — এই 'আঃ'-টার মতো।

এখন কী হয়?

❑ এখন বয়স হয়ে গেছে তো, এখন ওই আনন্দটা হয়তো আছে, কিন্তু ওরকম ততটা নয়। একটা কবিতা লিখে বুঝতে পারি যে, খারাপ হল, না ভালো হল। খারাপ হলে ফেলে দিই কি ছিঁড়ে ফেলি। আবার যখন বুঝতে পারি, যে একটা ভালো লিখেছি বেশ, তখন তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যায়, খিদে পায়।

একজন কবির কাছে সৃষ্টির আনন্দটাই কি চূড়ান্ত?

❑ একজন কবির কাছে আর যা-ই হওয়া উচিত, না-উচিত হোক, কিন্তু সে যাতে না খেয়ে না মরে, সেইটা একটু দেখার দরকার। এবং এটা হয়তো সম্ভব নয়। কেননা কবিতার ইতিহাস তাই বলে না।

তাহলে ধরুন, একটি তরুণ, সে কবিতা লিখছে এবং সে শুধু কবিতা লিখে জীবনযাপন করতে চায়। জীবিকানির্বাহ করতে চায়। আমাদের এখানকার যা পরিস্থিতি সেখানে কি এমন সম্ভব?

❑ না, কোনওমতেই না। কোনোকালেও সম্ভব ছিল না। তাহলে তো জীবনানন্দ একটা বিরাট প্রাসাদের উপর বাস করতেন। তিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন না। তা, এইটা আমাদের দেশে কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু, কখন সম্ভব? যখন তার কবিতার জন্য তাকে কোনো চাকরি দেওয়া হচ্ছে, কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান তাকে ডেকে নিচ্ছে, সে কবিতা লিখছে, সঙ্গে আরো অনেক কিছু লিখছে।

অর্থাৎ কবিতা লিখে জীবনযাপন করতে গেলে প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই প্রবেশ করতে হবে।

❑ সে তো বটেই। তুমি, না হলে টাকা পাবে কোথা থেকে? তোমায় টাকা কে দেবে?

তাহলে, একজন কবি; তাকে হয়তো একটা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ডেকে নিয়ে চাকরি দিল, সে কবিতাই লিখবে ভেবেছিল, এবার সে একটা গোটা উপন্যাস লিখে ফেলল...

❑ না, সেটা আমি বলতে পারছি না। তবে, অনেক উদাহরণ তো আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের আগের প্রজন্মের যেসব বিখ্যাত কবিরা রয়েছেন, তাঁরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জড়িত ছিলেন। সকলেই কি উপন্যাস লিখেছেন?

আমাদের দেশে তবে কবিতা লিখে জীবন একেবারেই কাটানো যায় না...

❑ কোনও দেশেই বোধহয় যায় না, আমার মনে হয়। আমেরিকায় হয়তো পাঁচ হাজার লোক টিকিট কেটে কবিতা শুনছে। সেইখানে হয়তো কিছুটা আছে। তবে, আমার মনে হয়, সেইখানেও এমন ঘটনা খুব বেশি নয়।

আচ্ছা, আপনার মনে হয় না, বিনয় মজুমদার কাটিয়ে দিলেন জীবনটা এইভাবে!

❑ না, জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু ওই পায়ের ওপর পা তুলে ঠান্ডা ঘরে বসে কাটিয়ে দিতে পারলেন না। এটা সম্ভব না। কিন্তু, তিনি যদি কবিতা না লিখে চাকরিটা করতেন, তাহলে তিনি আজকে তো প্যারিসের কোনও বার-এ বসে ফরাসি মদ খাচ্ছেন এবং কোনো মহিলা তাঁর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন, এরকম হত।

❑ অন্য জায়গায় যাচ্ছি। আপনি কবিতার মতো কবিতাকে অথবা তথাকথিত কবিতাকে একেবারে বাতিল করার কথা বলেছেন। কিন্তু আপনার কবিতার ক্ষেত্রে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও তথাকথিত কবিতার ফর্মের একেবারে আমূল বদল দেখা যায়নি।

❑ এখন কথা হচ্ছে দেখো, আমি হয়তো, হয়তো কেন, এমন অনেক কবিতা লিখেছি, যেগুলো তথাকথিত কবিতার মধ্যে পড়ে। হয়তো বেশিরভাগই। কিন্তু, আমি এর বিরোধী। আমি হয়তো লিখে ফেলেছি, লিখতে হয়েছে, না লিখে পারিনি। এখন, দশ-বারো বছর পর একটা নতুন ভাষা তৈরি হয়। নতুন-নতুন বিষয় আসে, নতুন কবিরা আসে, নতুন সময়ের কথা বলে। আমি যেটা বলেছি, সেটা হয়তো আমি সবটা পারিনি। কিন্তু, চেষ্টা ছিল তার মধ্যে। সেরকম প্রতিভাবান ছিলাম না হয়তো...।

আপনি বলেছেন, কবিতা বলতে আপনার মনে হয়, *'আলোয় সাজানো একটা পাহাড়ের ভেসে যাওয়ার মতো।'* আপনার কাছে কবিতা হয়তো এরকম একটা ইম্প্রেশনের সৃষ্টি করে; কিন্তু কবিতার ভিতরে যে গড়ে ওঠার কৌশল, সেটা খুব সচেতনতার দাবি করে, সেটাকে কি শুধু এভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

❑ কবিতা কী, সেটা তো আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। কতরকম কথা বলেছে কবিতা সম্পর্কে। এই, 'যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, জানি না, যদি, না জিজ্ঞাসা করেন, জানি', '*চমৎকারিতার দুহিতা*' — কতজনে কতরকম কথা বলে গেছেন। এখন আমি যেটা লিখেছিলাম, আমি একটা ছবি দেখতে পাই, যদি একটা এরকম পাহাড় হয়, যার সমস্ত ধারগুলোয় মোমবাতি জ্বলছে এবং সেটা আস্তে-আস্তে উঠছে ওপরে ফানুসের মতন, সেটা দেখার যে সৌন্দর্য একটা কবিতা পড়ার সৌন্দর্য সেরকম। এখন, কবিতার ভেতরে যে বিষয়টা রয়েছে, সেটা সচেতনতা দাবি করে।

আচ্ছা, এখান থেকেই কি আপনি বর্জন করলেন অনেক শব্দ...

❑ হ্যাঁ, সেইটা আমার প্রথম থেকে ঠিক করা ছিলই। একবার জয়-ও বলেছিল, 'আচ্ছা, ভাস্করদা আপনার কি কোনও লিস্ট করা আছে, যে এই-এই শব্দ ব্যবহার করবেন না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই সে তো মনের মধ্যে আছেই।'

আর আপনার কবিতার গড়ে ওঠা...

❑ আমার মনে হয়, কবিতা হচ্ছে এমন একটা সূক্ষ্মতম শিল্প, যার দ্বারা নিজেকে আনন্দিত করা যায়। যারা পড়বে, তাদের আনন্দ দেওয়া যায়। এমন একটা শিল্প, যাতে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে শেখা যায়। এই একমাত্র। এর অসাধারণ সূক্ষ্মতা। আমি জানি না, আমি কতটা করতে পেরেছি। তা, আমি কীভাবে ভেবেছিলাম কবিতাকে, আমি কীভাবে শব্দগুলো ভেবেছিলাম, ছবিগুলো ভেবেছিলাম — সেইগুলো আমার মনে হয়... — আমি বলতে পারি অনেক, কিন্তু অন্যদের বলা ঠিক হবে। কখনও হয় যে, একটা কবিতা লিখলাম, অনেক সময় চলে যায়, কবিতাটা শেষ হয় না। আবার কী অদ্ভুত কথা, মানে, পুরো কবিতাটাই সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে গেল। '*আমার যা কিছু*' — এই লেখাটার ঠিক আগে আমি ঘরে ছিলাম। হয়েছিল কী, আমি '*কোনি*' পড়ছিলাম। '*কোনি*'-টা যখন শেষ করলাম, আমি তখন ছাদটায় গেলাম। তখনও গলাটা বেশ ভারী হয়ে আছে, আটকে আছে। একটা দমবন্ধ-দমবন্ধ ভাব। সেই সময় আমার কাছে ছ-টা লাইন প্রায় আকাশ থেকে যেন ভেসে উঠল। একদম পরপর। আমি শুধু যখন এসে লিখলাম, তখনই সেই ছ-লাইনটা সাত লাইন হল।

আমি শুধু দারিদ্র্যের কথা জানি —
আর কোনো কথাই জানি না।
দেখেছি কিশোরী, তার ম্লান মুখ —
আমি আর কিছুই দেখিনি।
আমি শুধু
ভালোবাসবার কথা বুঝি —
আর কোনো কথাই বুঝি না।

এই যে কবিতাটা, যেটা আমার তখন থেকেই মনে ছিল, কিন্তু কখনও আমি আমার কবিতা-ভাবনাটাকে প্রকাশ করিনি। আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধু শামসের আমার এই কবিতাটা নিয়ে পরে লিখেছিল যে, কী আছে কবিতাটায়? কিন্তু আমার ভাবনাটা ছিল, কথার মধ্যে এমন রহস্য আছে, তাকে কবিতা করা যায়। এটা আমি কোথা থেকে পেয়েছিলাম, কোথা থেকে ভেবেছিলাম, কীভাবে ভেবেছিলাম, কিচ্ছু জানি না। কিন্তু এইটা আমার মনে হয়েছিল।

আচ্ছা, এমন কখনো হয়েছে — একটা জায়গা, আপনি কোনোদিন যেখানে যাননি, অথচ তার ছবি আপনার কাছে ভেসে উঠেছে, আপনার লেখাতেও হয়তো চলে এসেছে।

❑ লিখব কী, আমি দেখতেই পেতাম, বিকেলের রাস্তায় মাঝে-মাঝে একটা ওভারকোটের দুটো পকেটে হাত ঢুকিয়ে, ওই আস্তে-আস্তে বরফ পড়ছে, হেঁটে যাচ্ছি ফুটপাথ ধরে, সেই এখানকার মতোই একা-একা, এটা তো দেখতে পেতাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা বোধহয় বেশি গল্প-টল্প পড়ার ফল।

কবিতার মধ্যে একটা স্কিল দেখানো, একটা কৌশল দেখানো, একটা চমক — এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

❑ অতি খারাপ জিনিস। গিমিক আবার কখনও কবিতা হয় নাকি? কিন্তু একজন কবির যে স্কিল, যে শৈলী, সেটা বোঝা যায় কবিতাটা পড়ে। কিন্তু কখনও বুঝতে পারবে না, তার মধ্যে কোনও চালাকি আছে কি চমক দেওয়ার চেষ্টা আছে। আমি একটা সময় বলেছিলাম এবং বোধহয় '*শয়নযান*'-এও লিখেছি যে, কবিতার একটা লাইন কোথা থেকে পড়া হবে, কোথা থেকে শুরু হবে, জানি না এবং কোথায় শেষ হবে, সেটাও জানি না। এই হচ্ছে ব্যাপার। এর মধ্যে কোনো গিমিক নেই। কিন্তু, এইরকমভাবে শেষ করব, কি প্রথম লাইনটা এইরকমভাবে শুরু করব, এরকম একটা দিতে হবে — তুষারের ভাষায় 'জগঝম্প', সেরকম দিতে গিয়ে অনেকে ঝামেলায় পড়ে যায়। আমার মনে হয় সেটা ঠিক নয়। একবার একটা ঘরে অনেক বিদ্বৎজন ছিলেন, আমাকে সেখানে কবিতা পড়তে ডাকা হয়েছে, এরকম একটা টেপ চলছে, আমি আমার লেখা পড়ে যাচ্ছি। পড়তে-পড়তে শেষ কবিতা পড়ে চুপ করে গেছি। কিন্তু টেপ চলছে তো চলছেই। বলছে, 'কী হল, পড়ুন'। দু-তিনবার বলেছে এরকম। তা, এই যে ব্যাপারটা এটা তো তৈরি হয়েছে, আমার কল্পনা, বোধ থেকে তৈরি করতে হয়েছে ব্যাপারটা। খালি এখন, এখনকার কবিতার পাঠক, অনেক শিক্ষিত হওয়া উচিত। কারণ, কবিতা জানলে তো সবকিছুই জানা হয়ে গেল।

আপনার কবিতার মধ্যে আমরা একটা সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি অনুভব করি। যেটা দীর্ঘ কবিতা লেখার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। কিন্তু আপনার কবিতার মধ্যে সেই অর্থে দীর্ঘ কবিতা নেই। কেন?

❑ কেন? সম্প্রতি তো একটা লিখলাম। সে একশো পাতার। দ্যাখো, একটা কথা আছে না চিনেদের, যে, তেরো লাইনের মধ্যে যদি কেউ কিছু লিখে কিছু না বোঝাতে পারে, তাহলে না-লেখাই ভালো তার। এখন অনেক ভালো দীর্ঘ কবিতা সম্প্রতি দশ বছর ধরে লেখা হয়েছে। তার মধ্যে ভালো কবিতা আছে, হ্যাঁ। কিন্তু, অনেক কবিতা আবার দীর্ঘায়ত করা হয়, এইটা বলছি। ছ-লাইন, সাত-লাইনের কবিতা আমি বিশেষ পছন্দ করি, আমার ভালো লাগে। এই ধরনের কবিতার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। এখন দীর্ঘ কবিতা লেখা সত্যি শক্ত ব্যাপার খুব, আমাদের বাংলা ভাষায় খুব সফল দীর্ঘ কবিতা অনেকে লিখেছেন, ভালো কবিতা লিখেছেন, মহৎ কবিতা লিখেছেন। কিন্তু আমার কোথায় যেন আটকায়, সেটা কি এরকম কারণে হতে পারে যে, আমরা যখন এলিয়ট পড়তাম, '*ওয়েস্টল্যান্ড*' পড়তাম, তখন মনে হত, '*ওয়েস্টল্যান্ড*'-এর চেয়ে যদি ভালো না লিখতে পারলাম, তাহলে আর দীর্ঘ কবিতা লিখে কী হবে? একবার, একজন, খুব মান্য করি এমন একজন আমাকে বলল, 'কী, ভাস্কর কবিতা এত ছোটো-ছোটো হয়ে যাচ্ছে কেন? ফাঁকি?' আমি তখন বললাম, 'না দেখুন, আমি বোবা হয়ে যাচ্ছি বোধহয়।'

নব্বই এবং তার পরের কবিতা। এসময়ে যারা লেখালিখি করছে, তাদের সম্পর্কে আপনার মত কী?

❑ বছর দুই-তিন আগেও একবার আমি, বলেছিলাম, আমি খুব বিষন্ন এই জন্য যে, আমার তো এখনও তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। যাদের অল্প, একটু-আধটু ভালো লাগছে, তারা খুব ছোটো, কী করবে জানি না। কিন্তু এখন আর এটা বলা যাবে না। এখন একটু একটু করে ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে। কারা সত্যিকারের লিখতে এসেছে, তারা শেষ পর্যন্ত যদি লেখে, তাহলে খারাপ হবে না কিছু। এমন কয়েকজন তো আছেই, আছেই নব্বই-এর মধ্যে। তাদের নাম সকলে নিশ্চয়ই দু-তিন বছরের মধ্যে জেনে যাবেন।

যারা সত্যিই কবিতা লিখতে চাইছে, তাদের কি আপনার কিছু বলার আছে?

❑ যারা সত্যি কবিতা লিখতে চাইছে, তাদের কিছু বলার নেই, তারা লিখবেই, আমি বলি আর না-বলি।

না, অন্তত ট্রেন্ডের দিক থেকে বলুন। কবিতার এই যে একটা যৌথ সামাজিক চেহারা তৈরি হয়েছে...

❑ ওগুলো তো, একটা বয়েসে তারা সবই বুঝবে যে কারা কবিতা লিখতে চায়, কারা অন্য জিনিস চায়। কথা হচ্ছে যে, যারা লিখবে নতুন, তাদের একটা, আমার মনে হয়, বুদ্ধির তীক্ষ্মতাটা থাকবে যে, তিনি কী চান এবং না-চান, এটা খুব তাড়াতাড়ি তাকে বুঝে নিতে হবে। আগে যেরকম ছিল, এখন আর নেই। এখন কবিতা লিখে একটা সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। আরে বাবা, যারা জীবনে কবিতা পড়েনি, তারাও বলছে, 'দেখেছ, এ কী নাম করেছে!' কমলদা একটা কথা বলতেন, কোনও বিষয়ে কেউ যদি বারফট্টাই করে, তাকে একটু টিপে ধরবে। টিপে ধরলেই দেখবে যে, মজাটা কীরকম। 'ওঃ হোঃ আপনাদের কবিতা তো এই। বাবা, মিল নেই কিছু না, কী যে লেখেন ছাই, বোঝা যায় না।' — 'ও, বোঝা যায় না, তা তুমি কবিতা কবে বুঝতে বলো তো? রবীন্দ্রনাথের কবিতা ক-টা পড়েছ? বোঝাও তো একটু।' এরকম দেখবে। কবিতা-পাঠক তো বেশি থাকে না। এখন ধরো, আমরা যারা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি, মানে প্রায় বলতে গেলে কিছুই চাইনি, না চাইতে-চাইতে এবং না পেয়ে-পেয়ে বড়ো হয়েছি। এর জন্য কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু, আমরা এইটা কখনো চাইনি যে, সোশ্যাল ক্লাইম্বার হওয়া।

পাশ্চাত্যের কথা বাদ দিলাম। আমাদের এই অঞ্চলে, কিছুদিন হল উত্তর-আধুনিক কবিতা বা পোস্ট-মডার্ন পোয়েট্রি নিয়ে একটা চিৎকার হচ্ছে। এগুলো আদৌ কতটা পোস্ট-মডার্ন এবং কতটা কবিতা?

❑ এই প্রশ্নটার ভয়ই করছিলাম। আমি জানি না। আধুনিকতা আর উত্তর-আধুনিকতা খুব গুলিয়ে ফেলেছি। আমি দেখেছি, আমাদের এখানকার আধুনিক কবিতা সঙ্কলনে আমার কবিতা রয়েছে, উত্তর-আধুনিক সঙ্কলনে, সেখানেও আমার কবিতা রয়েছে। যিনি সম্পাদক তিনি বলছেন, আপনিই আমাদের ভরসা। আমি বলতে চাই, উত্তর-আধুনিক যে সমস্ত কবিতা এবং আধুনিক কবিরা যেসব কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে কি খুব একটা ফারাক আছে?

শেষ প্রশ্ন। আপনার এখনকার লেখালিখি এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ — এ বিষয়ে আপনার চিন্তাভাবনা এখন কী অবস্থায় রয়েছে?

❑ 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব'। এখন কথা হচ্ছে, আমি যদি এই বইমেলায় চাইতাম, আমার দুটো আলাদা স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে, দুটোই বার করা যেত। একটা খুব ভালো অফার আমার কাছে এসেছিল এবং এখনও আছে। এত ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছিলাম গত বছরখানেক এবং এখনও আছি, যোগাযোগই হচ্ছে না। আমার পুরোনো বইয়ের নতুন এডিশন হওয়ার কথা ছিল, যাওয়াই হয়নি। যেটা আমি কাটাতে চেষ্টা করছি, ওই ডিপ্রেশন একটা পড়ে যাওয়াতে, বছর দেড়েক ধরে প্রচণ্ড একটা..., যেটা আগে কখনও হয়নি, মানে, লেখা আমার বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু, এবারে আমার মনে হয় — কেটে যাবে এবং এবারে আবার শুরু করব লিখতে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

ঋত্বিক মল্লিক, বিশ্বজিৎ পাল, সম্বিত পাল ও সুস্নাত চৌধুরী

...কিন্তু, এই চিঠি তুমি কেবল প-ড়-লে — লেখাকালীন কর্কশ খসখসে শব্দ তো তুমি শুনতে পেলে না!

প্রিয় ভাস্কর : সুব্রত চক্রবর্তীর দশটি চিঠি

ভাস্কর চক্রবর্তীকে এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন তাঁর কবিবন্ধু সুব্রত চক্রবর্তী। ২৫ জুন ১৯৭১ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭৮-এর মধ্যে। এর পরপরই উত্তরপাড়া থেকে প্রকাশিত 'ডাকঘর' (সম্পাদক : গৌতম মুন্সি) পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় (মার্চ ১৯৮২) চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়। ততদিনে মারা গিয়েছেন সুব্রত। চিঠিগুলি পাওয়া যায় মালা চক্রবর্তী ও ভাস্কর চক্রবর্তীর সৌজন্যে।

বিস্মৃতপ্রায় চিঠিগুলির গুরুত্ব ও আকর্ষণ বিবেচনা করেই এই পুনর্মুদ্রণ। বেশ কিছু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বানান মোটামুটি অবিকৃতই রাখা হল।

২৫.৬.৭১

আমাদের বাড়িতে কোনো লেটার-বক্স নেই। অনেকদিন পরে, বর্ধমানে ফিরে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে খোঁজ করে নিয়ে আসি আমার অনুপস্থিতকালে আসা কয়েকটি চিঠি। বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তোমারই চিঠি আমি পাই, আরও যে-সব চিঠি ছিলো ঐগুলি যাঁদের, তাঁরা কেউই ঠিক বন্ধু নন, যদিও খুবই আপনার। তোমার চিঠিই প্রথমে খুলি ও পড়ি এবং বারংবার পড়ি। খুবই ভালো লাগে আমার ঐ চিঠি পড়তে, এবং একথা বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই আনন্দিত করবে যে এটা আমার মনের কথা। আমি দীর্ঘদিন, কলকাতার বাইরে আছি, এ একধরনের শেকড়-ওপড়ানো নির্ব্বাসন এবং এটুকুও আমি মনে মনে ঠিকই বুঝে নিয়েছি যে এই মূলহীনভাবে বাকি জীবনটুকু আমাকে যে কোনোভাবেই হোক টেনে নিয়ে যেতে হবে। এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই যার সাহচর্যে আমার খানিকটা সময়ও আনন্দে বা উত্তেজনায় কাটবে, কোনো শত্রুও তেমন নেই আমার এখানে যাকে ভেবে গোপন বাঘনখটা সকাল বেলাতেই শানিয়ে নিতে পারি। স্বপ্ন নেই, স্বপ্নহীনতাও না। প্রসন্নতা আমার কোনোদিনও ছিলো কি-না আজ আর মনেই পড়ে না যে, জব্দ হয়েছি খুব কবি ও কবিতাকে সমপরিমাণে, উনিশ-বিশ অবশ্য হতেই পারে, ভালোবেসে, এবং প্রসন্নতার বদলে আজ আমাকে পেয়ে বসেছে অতি-বিনয় যা ভয়-ত্রাস ও কপটতারই রকমফের। অনেক ভুল করে ফেলেছি, সামান্য একটা ভুলেই তো একজীবনের ভুলচুক হয়ে যায়, এতো অ-নে-ক ভুল, ভুল কিংবা বসে বসে বিরতি-বিহীনভাবে আঙুল মটকানো, যা আরামের — এবং সংশোধনহারা এইসব ভুলের কবলেই নষ্ট হয়ে গেছে সময়, ও ঐ-সব সু-সময় আজ এতোদূরে, পিছনে পড়ে আছে যে ঘাড় মুচড়ে দিলেও সময়ের অবিনশ্বর ছোবল আজ আর চোখেই পড়ে না। এ-সব সমস্যা কম-বেশি সম্ভবত আমাদের অনেকেরই আছে, কিন্তু যেহেতু নিজের ব্যাপারটা বেশি রহস্যহীন সেটাকেই প্রকাণ্ড মনে হয়। অবশ্যই এটুকু বুঝি সকলেই আমরা আজ পালানো প্র্যাকটিস্ করছি, ও সুধীন দত্তর ন্যাকামি-জব্দ পদ্য 'কোথায় পালাবে...' ইত্যাদি আজ আর আমাদের মনেও পড়ে না। বদলে ধীরগতি কেন্ন-র মৃদুহাস্য আমাদের বেকুব করে।

আমাদের উদ্ধার, হতে পারে, একমাত্র লেখাতেই। অবশ্য-ই আধুনিক লেখা আমাদের লিখতে হবে, ও এই আধুনিকতা অনেক-রকম। আমাদের সময়ের মূল-মুস্কিলই হলো আমাদের আমরা সংগঠিত করতে পারিনি, পূর্ব্ববর্তীদের কোরাসে আমাদের গলা অনেক সময়ই ঢাকা পড়েছে। যে বিচ্ছিন্নতা বা বিষণ্ণতার কষ্ট তোমার চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে, তা আসলে extra energy-র, যে energy শুধুমাত্র কবিতা লিখে শেষ করা যায় না। ঐ extra energy-র জন্যই বুদ্ধদেব Film-এ সরে যাচ্ছে, বেলাল সৎ ও কষ্টকর জীবনযাপন করে, দেবাশিস তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা নিয়ে বছরের পর বছর স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এসব ছাড়াও আমার মনে হয় কেবলমাত্র কবিতাসংক্রান্ত কিছু-কিছু সাংগঠনিক কাজকর্ম করার আছে, একমাত্র যে ধরনের কাজকর্ম নিরবচ্ছিন্নভাবে করে-করে ৫০-এর ওঁরা জিতে আছেন এখন পর্যন্ত। এ-কোনো দ্বেষের কথা নয়, কিংবা ঢেকুর — কেননা সাহিত্য তো এমন কোনো মহৎ বাৎকম্মো নয় যে যে-টা করতে না পারলেই পরামর্শের ঢেকুর উঠবে! ৫০-এর ওঁদের তুলনাতেও পরমাশ্চর্য ও আধুনিক কবিতা তোমরা অনেকেই লিখেছো, কিন্তু ব্যবস্থা ছিলো না, ব্যবস্থার জন্য তৎপরতাও অমনোযোগে নষ্ট ছিলো। অনাদিকাল থেকে আপ-টু পঞ্চাশ কবিতা মোটামুটি আর্ত-বিস্ময় নির্ভর। আমাদের মধ্যেই প্রথম এসেছে শীতল বিবেচকের চৈতন্য। এ কোনো ঘোষণা নয়, কেননা কবিতাও যা বোঝাতে পারবে না তা নিয়ে আলাদা কোনো ম্যানিফেস্টো গা-চুলকানিরই প্রথান্তর। শীতল বিবেচনা ও সামাজিক ও ব্যক্তিগত crisis থেকেই ঠিক এখনকার আধুনিক কবিতা লেখা হচ্ছে বলে মনে হয়, এতাবৎকালের চর্ব্বিত সামগ্রী নয় কিছু, এবং শক্তি-সুনীল-উৎপল-বিনয়ের মহান কবিতার পিছনে বা সামনে নয় এখনকার কবিতা, — পাশে, একটু সরে এবং সমান্তরাল নয়, আড়াআড়ি। এরকম কবিতামূলক সংগঠনই তোমাকে বা আমাকে সুস্থ রাখতে পারে, সুন্দর ও বাঁচিয়ে রাখতে পারে। খুব দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। চিঠি দিও। ভালোবাসা। একবার আসবে?

পুনঃ খুব অব্যবস্থার মধ্যে চিঠি লিখলাম, ভালো-করে লেখা হলো না। তবে যে কথাটা বলতে চেয়েছি, একটু ভেবে দেখো, আমাদের জন্য।

১.২.৭২

কিছুদিন হলো ঘুমোতে যাওয়ার আগে কাচের ওপাশে একজন মানুষকে দেখতে পেলাম। আমার ও ঐ মানুষটার দূরত্ব — কাচ থেকে — হুবহু সমান। ঐ মানুষটা ওদেরই একজন, যারা শান্তি ও সহিষ্ণু, ভীরু ও সাবধানী, ভোঁতা ও হিসাবী। মনে হলো, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তেজ, অহঙ্কার এবং একগুঁয়েমিও যেন আছে। অবিশ্বাস ও সন্দেহ, ভয় ও দুর্ব্বলতা, সাহস আর তেজ, বিষাদ এবং হাসিখুশিভাব, ভোঁতামি আর ধারালো যুক্তি, সংযম ও আন্তরিকতা — সবকিছু নিয়ে মানুষটা বেশ জবর এক প্যাঁচে আছে — এরকম মনে হলো। 'কার ওপর তুই মুখভার করে আছিস রে ছোঁড়া, কে তোর মুখভারের মর্যাদা রাখবে' — তাকে বললে, সে-ও অবিকল আমারই মতন ঠোঁট নাড়ছে আমি দেখতে পেলাম, ঐ লোকটাও ঐ একই ভর্ৎসনাই আমাকে করেছিলো নিঃশব্দে। ঐ সময়ে, আঙুল মটকালে কোনো শব্দ হলো না ও আঙুলের

হাড়ে ধাতুশৈত্যপ্রবাহ আমি টের পেয়েছিলাম। পরে, ঘুমোলে আমি একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি — একটি মেয়ে, যুবতীই তো সে, তার রক্তমাখা চুল আমার মুখে আছড়াচ্ছে। আর কিছু নয় — কেবল এটুকুই। সকালে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলাম ঐ স্বপ্ন ভুলে যেতে, কিন্তু সপ্‌সপে মুখটা মুছলে তোয়ালেতে লেগে যায় রক্ত! জীবনে এমন আতংকগ্রস্ত আর কখনো হইনি। বেলা হলে, তোমার চিঠি পেলাম। এই চিঠি উপহার — মমতাময় ও খর — যা মানুষকে এক দ্রুত টানাপোড়েনের দিকে নিয়ে যায়। অনন্যোপায়ভাবে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আছি, যদিও নিঃসঙ্গতার মহত্তর টান আমাদের নিয়ে কী মজার খেলাটাই না খেলছে! আমার কথা ভেবে যদি কখনো মন খারাপ হয়, তবে — সঠিক জেনো — ঐ সময়ে তোমার কথা ভেবে আমারও মন খারাপ হয়ে আছে। কিন্তু, এই চিঠি তুমি কেবল প-ড়-লে — লেখাকালীন কর্কশ খসখসে শব্দ তো তুমি শুনতে পেলে না!

শনিবার কলকাতায় যাচ্ছি। দুপুর দুটো নাগাদ গল্পকবিতায় আসতে পারো কি? ভালোবাসা।

১৬.২.৭২

ফিরে এসেই আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে একদিন বাড়িতে ছিলাম একটানা — কোথাও বেরুইনি, কোনো কাজই আমার দ্বারা হলো না; আজ, আবার কলেজে যাবো। নানারকম অদ্ভুত আতংকের মধ্যে আমার সময় কাটছে। 'পাথরের ছায়া' এভাবেই ঢেকে ফেলছে আমাকে। 'পাথরের ছায়া' — কোনো কবিত্ব নয়; তুমি নিশ্চয়ই এর অসহায়ত্ব জানো এবং জানো বলেই তোমাকে লিখলাম। একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে, সহসা কিছু এবং শূন্যে পতনশীল বস্তুর মতই, নিরুপায় আমি, ঐ নিশ্চিত 'কিছু'র দিকে, ক্রমবর্ধমান গতিতে, পড়ছি। এখন দেখা যাক। আমার অহংকার ও আমি — দুজনেই এখন ঐ ভীতির মধ্যে যে ভীতি, নির্জ্জনতা বা নৈঃসঙ্গের রকমফের নয়। সত্যিই, অদ্ভুত এক থমকানো অবস্থায় আছি। 'গীতবিতান' ছাড়া আর কিছু পড়তে পারি না, এখন।

আমাদের নিয়ে যে প্রাকৃতিক ক্রিয়া — তার মধ্যে সুনিশ্চিত এক ঢল আছে — ঐ ঢল কোনো রহস্য বা ভাবুকতা নয়। বিচিত্র এক শুচিবায়ুগ্রস্ত মানসিকতা আমাদের নিয়ে কী রগড়টাই না করে চলেছে! আমরা, বাস্তবিকই, বড় আমোদপ্রিয় মানুষ — কিন্তু, দিকে দিকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, নানাবিধ আবিষ্কার যদিও খুব — আগুন, নারী ও নেশা ছাড়া অদ্যাবধি আর কোনো 'আমোদ' আবিষ্কার হলো না। যদি কোনো অতি ব্যক্তিগত, আধুনিক ও গভীর আমোদ পেয়ে যেতাম, তাহলে লেখালেখিময় এ জীবন বহনীয় হতো, হয়তো!

তোমার বই, মনোযোগে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাকে আরও অনেকবার পড়তে হবে। তারপরে তোমাকে বিস্তারিত লিখবো।

ভালোবাসা।

২৫.২.৭২

আতংক সম্পর্কে তুমি যে সোজাসুজি মন্তব্য করেছো — অর্থাৎ 'কিছুই নয়' — মনে-মনে সামান্য আপত্তি করে, শেষ পর্যন্ত তা, মেনে নিচ্ছি; কিন্তু কাজে জড়িয়ে গেলেই ঐ আতংক চলে যাবে — এই সরল সমাধান, সত্যিই মেনে নিতে পারলাম না, ভাই। না-পারার কারণ অনেক, প্রথম ৩-টি হয় :

১। আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ-প্রবণতা, যা নিজেকে সদাজাগ্রত রাখার পথে বিষম বাধা। আমাদের কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত মানসিকতা নেই — জীবনে ও/বা ধর্মে, আমরা তাই আর তেরিয়া হতে পারি না। চোখদুটো ছাড়া আর টান-টান করার মতন কিছুই অবশিষ্ট নেই আজ।

২। নিজের প্রতি যথার্থ মমত্ববোধের অর্থাৎ মায়াহীনতা। কেননা, যৎসামান্য সচেতনার আমাদের Consumptivity — এটুকু আমরা ঠিকই বুঝি, এই আত্মমমত্বের ভেতর এক পিছল ঢল আছে, যা সহসা — অসতর্ক আমাদের সটান নিয়ে ফেলবে স্বার্থপরতার রক্ত-থুতুতে। মায়া হয় ঐ হাঁ-দাঁতহীন, কামড় নেই, কেবলই নরম গাগুলোনো রক্তাক্ত — মাড়ির পিচ্ছিলতা আছে। দৈনিকাদি-ঘোষিত মানুষের প্রতি লালাসিক্ত এঁটো দরদ আমাদের সত্যিই নেই — কিন্তু আমরা যাবতীয় কাজ-অকাজ-কুকাজের মধ্যে আপ্রাণ মানবিকই হতে ও থাকতে চাই।

৩। আমাদের কোনো কমিটি নেই। যাবতীয় আদর্শ ও প্রগতিশীলতা নিয়ে যখন বজ্জাতি চলেছে — দেশে যত খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে, সমানুপাতে নয়, দ্রুততরগতিতে বাড়ছে অনাহারীর সংখ্যা (অনেক উদাহরণের ১টি) — ঐ সময়ে কানের কাছে কেউ ঘন-ঘন 'আরও স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকুন' বললে, বাস্তবিকই নাকে তার, বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর সাহায্যে, তর্জনীর দ্বারা বাঙলায় ছোট্ট ১টা মুখখারাপ করে — আলতো ১টি টোকা মেরে খিক্‌খিক্ হেসে ফেলা কর্তব্য ছিলো না-কি আমাদের? 'গরীবী হটাও' পোষ্টারের ওপর কী করা উচিত ছিলো আমাদের, আমরা সকলেই জানি। হায় আমরা তবু গম্ভীর মুখে কেবল-ই ১১ই মার্চের জন্য অপেক্ষা করি — জীবনে ও/বা ধর্মে আমরা তেরিয়া হতে পারি না। ফলে, চাকরি-টাকরি বা পরিবার তুষ্টি ইত্যাদি কাজে জড়িয়ে আর আতংকমুক্ত হলাম — বিষয়টা কি সত্যিই এতো সহজ? তবে, তোমার কথার মানে যদি এরকম করা যায় — ঐ আতংককেই কাজে লাগানো উচিত, (এবং লেখা ছাড়া আমাদের আর কোনো যোগ্যতা নেই) আমি তোমাকে সমর্থন করি; পেরে উঠবো কিনা জানি না, কেননা সেটা ব্যক্তিগত ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। এখন, আমার কাছে, লেখালেখির ব্যাপারে 'পাচার' করা ছাড়া মহত্তর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আত্মকেন্দ্রিক হবো — অর্থাৎ নিজেকে, dialectically, নানা বাস্তবতায়, নুয়ে পড়া মানুষের ভিড়ে, সমকালীন ধর্মে, তার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা, সম্প্রসারিত করা। তাই চাই, পারবো কিনা জানি — কেননা মিনিমাম বাঁচার জন্য এর প্রয়োজন হলো।

দেবাশিসকে কয়েকদিনের মধ্যে বই পাঠাচ্ছি। মার্চে কলকাতায় যাবো, তখন, তোমার জন্য 'পুরী-সিরিজ' নিয়ে যাবো। ডাকে পাঠাতে ভয় করে — যদি না পাও!

তুমি ভালো আছো জেনে খুব খুশী হলাম, এটা আমার মনের কথা। চিঠি দিও — চিঠি পেলে, সত্যিই খুব ভালো থাকি।

ভালোবাসা জেনো।

৬.৬.৭২

কতদিন হ'য়ে গেছে, আমরা পরস্পরকে 'ভালো আছি' লিখি না, লিখতে পারিনি এ কথা ভাবলে বুকটা কেমন করে ওঠে। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি নিজেকে দিয়েই বুঝি এবং ভুল বুঝি না। total এবং absolute হতে গিয়ে আমরা ফেটে গেছি —প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ব্ববর্তী মুহূর্তের সংঘর্ষজাত, এভাবে কতদিন চলবে জানি না। তবে এভাবেই চলছে এবং মনে হয় ছাতাবন্ধ করে গাছতলার দিকে টুক করে সরে পড়ার বেশি দেরি নেই। তোমার 'ক্ষয়' আমি বুঝি — Sensitive মানুষ মাত্রেরই এটা থাকে। এখন তুমি বা আমি কিভাবে বাঁচবো সেটাই প্রশ্ন এবং আমাদের কাছে আমাদের বাঁচাটাই দারুণ interesting নয় কি? পর্শু, ৮ই জুন কলকাতায় যাচ্ছি ১৮ই জুন, শনিবার পর্যন্ত থাকবো। ৩ দিনই আশা করি তোমার সংগে দেখা হবে — ৫/৫-৩০টার সময়ে কফিহাউসে থাকবো, কাউকে না পেলে ইন্দ্রদার দোকানে।

এখানে এখনো বৃষ্টি নামেনি তেমন, তবে আর দেরি নেই। তুমি এবার অবশ্যই এসো। ভালোবাসা জেনো।

৩১.৮.৭৪

তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগলো। তুমি ভালো আছো এই খবরে সত্যিই আনন্দিত হই। কিন্তু তুমি এ্যাতো ভালো আছো জেনে মনটা কিছু ধন্দে আছে। এ্যাতোটা ভালো থাকা আমাদের পক্ষে বোধহয় আর সম্ভব নয়। কিংবা, হয়তো

আমার সিনিসিজম্‌ আমাকে এমন ভাবায়। ঘরপোড়া মানুষ, সিঁদুরে মেঘ দেখে, গরুর মতই, বিহ্বল হয়ে পড়ি। তবু ভালো থেকো, যতোটা পারো মন ও গা বাঁচিয়ে থেকো। আমিও চেষ্টা করছি, বুদ্ধদেবও করছে, দেবাশিসের কথা বলতে পারি না, তবে সে নিশ্চয়ই, প্রকারান্তরে ভালোই আছে। আমাদের সকলের হাসিখুশি মুখের ১টা গ্রুপ-ফটো তোলাবো — আমাদের ছেলেমেয়েকে ঐ ছবি দেখিয়ে বলবো, এই দ্যাখো আমরা এমনটা ছিলাম এবং অবিশ্বাস করলে হেসে বলবো : Camera never speaks lie.

তোমার চিঠির ২টি অংশ পড়ে ২ বার মুচকি হেসেছিলুম, মনে পড়ছে। ১ বার : যেদিন তোমার ও আমার শক্তিদার বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিলো, ঐদিন আমিও যাইনি, শক্তিদা একথা বলেছেন জেনে। তবে কি এটা স্বপ্ন বা মায়া যে ঐ দিন শক্তিদার বাড়ীতে ১ ঘন্টাটাক ছিলুম, যোগব্রত ছিলো, সেখান থেকে সুনীলদার বাড়ীতে, পথে শক্তিদার ২টো বিয়ার-ক্রয়, সুনীলদার বাড়ীতে ঐ দুটো ও আরও... এই সব! আমরা অনেক-কিছু মনে রাখি, এবং মনে যে রাখি, এটা স্বীকারও করি, আমাদের অনেক গণ্ডগোলের মূলে এ ব্যাপারটাও অন্যতম। শক্তিদা অনেক কিছু ভুলে যান এবং ভুলে গিয়ে, দেখতেই পাচ্ছো, দিব্যি ভালো থাকেন। always fresh & charming শক্তিদার কথা মনে পড়লে, টুপি তুলতে ভুলি না।

২য় মুচকি হাসি এই জন্য যে, তুমি কি করে ভাবতে পারলে, 'এক্ষণ'এ তোমার লেখা পাঠাতে ভুলেও যেতে পারি! কলকাতা থেকে ফিরে এসে ২/৩ দিনের মধ্যেই তোমার লেখা নির্মাল্যবাবুকে পাঠিয়েছি, সঙ্গে আমারও ১টা। কিন্তু 'এক্ষণ' বেরোচ্ছে তো? বেরোলে, আমাদের লেখা আশাকরি ছাপা হবে। 'কৃত্তিবাস'এ লেখা দিয়েছো? 'কলকাতা'য়। চতুর্দিকে লেখো, লিখেই টের পাওয়াতে হবে, আমরা লিখছি এবং তারপর প্রয়োজন হলে ১ দিন সংঘবদ্ধ হয়ে বলা যাবে, দেখুন/দ্যাখো হে, আমরা এইসব লিখছিলাম। খারাপ লিখছিলাম? ১ দিন একটু অন্তত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে পারার জন্যই, আজ তোমাকে নদীর এপার থেকে, ঘুমের এপার থেকে বলছি, লেখো লেখো!

তোমাকে অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। আমার কথা, আমাদের কথা। কিন্তু মনস্থির করে লিখতে পারছি না। মালার জন্য উদ্বেগ তোমার আমি বুঝতে পারি। আমারও অনেক গাফিলতি হয়ে যায়। আমার introspection আমাকে দিয়ে, বেচারার মতই, নানা পারিবারিক ভুল করায়। এখন ডাক্তারী চিকিৎসা চলছে ওর। Anxiety tension এবং সেজন্যই মাথাব্যথা, শরীর খারাপ সবই। আমার জন্যই প্রধানত এবং রুমনি-রুদ্রর জন্যও কিছুটা, বড় ভাবে ও। অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে Valium 5 দৈনিক ২টি খায়।

আমার শরীর মোটামুটি ভালোই আছে, মানসিক অবস্থা যদিও বিপর্যস্ত। এক ধারাবাহিক গলাধাক্কায় নিজেকে বড় কাবু মনে হয়। মাঝে মাঝে নিজেকে 'হো-হো-হেইইই-হো-ও-ও-ও' বলে সাবধান করি বলে বেঁচে আছি। আমাকে আজকাল আর কেউ সাবধান করে না। 'আমার জন্য আমিই শুধু একা' ( )।

৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় যাবো। বিকেলে সুবর্ণরেখায় নিশ্চয়ই এসো। তোমার কাছে থাকবো। তুমি কি ইতিমধ্যে ANTHOLOGY সম্পর্কে সামান্যতম এগোতে পারলে? ভালোবাসা জেনো।

১১.৪.৭৫

এখান থেকে ফিরে গিয়েই তুমি যে চিঠি দিয়েছিলে, সময় মতোই পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে দেরী হোলো বেশ — নিজেরই খারাপ লাগছে। সে দিন তুমি আসায় আমি সম্মানিত হয়েছিলাম, তোমার বন্ধুত্ব আমাকে ঋণী করে। সেদিন ফিরে গিয়ে খাবার না থাকায় তুমি কষ্ট পেলে, অথচ এখানে তোমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থানুযায়ী এতো খাবার ছিল যে আমি ও মালা, পাড়ার ২/১ জন সহ খেয়ে শেষ করতে পারিনি। আবার যে তোমার আসার কথা ছিল, এলে না যে বড়!

আমি ইতিমধ্যে বার দুয়েক কলকাতা থেকে ঘুরে এলাম — ২ দিনই বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা হলো, যা অসচরাচর। তোমার সম্পর্কে আমরা এতো কথা বলি যে, বলা যায়, সশরীর না হলেও, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে। ১ দিন আনন্দবাজারে গিয়েছিলাম — কারুর সঙ্গেই দেখা হলো না। নীরেনবাবুর সঙ্গে প্রয়োজন ছিল আমার, বুদ্ধদেবের বিমল করের সঙ্গে; বিমল কর ছিলেন, নীরেনবাবুর সেদিন Offday যাই হোক, সেখান থেকে বেরিয়ে স্প্লেনেডে ঘুরতে ঘুরতে বারবার ও পুনঃপুনঃ আশা করছিলাম যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! গত সোমবার বিকেলে সন্ধ্যায় তুমি কী করছিলে? তোমার শরীর ভালো আছে তো?

কে যেন বলছিলো তুমি অনেক কবিতা লিখেছো এখন। আমার উল্লাস গ্রহণ করো। আমি তোমার কবিতার একজন fan — যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কবিতা পড়তে আমি বর্তমানে আগ্রহ বোধ করি — তুমি তাদেরই একজন। এবং হয়তো তুমিই সেই, যে absurdity-র দাসত্ব আমি মেনে নিয়েছি, কবি, ঐ absurdity-কে শাসন করতে শিখেছো। তোমার নতুন লেখাগুলি পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম। তোমার কবিতার সিক্ততা বহুদিন গায়ে লেগে থাকে।

কামুর নোটবুক থেকে : I am not a poet, but I should have no second thoughts about being delighted by such a poem if were beautiful one either serves the whole of man or one does not serve him at all. And if man needs bread and justice and if we have to do everything essential to serve this need, he also needs pure beauty which is the bread of his heart. Nothing else matters. Yes, I should like them to take them to take sides less in their books and little more in their everyday life.

কামুর নোট থেকে এটুকু কেন লিখলাম, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আমাদের কথা পরস্পরকে যদি একটু বোঝাতে পারি, বাঁচার কিছুটা সুবিধে হবে বলে মনে হয়। জীবনের সর্বত্র Rejection ও অপমান আমাদের কীভাবে কোণঠাসা করেছে, তুমিও জানো। এখন প্রকাশ্যে ও সদম্ভে আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসা প্রয়োজন — যেন আমরা সবসময়েই অন্যজনের উপস্থিতি ও স্পর্শ টের পাই — এবং We must love each other with despair. Nothing else matters. আমি কিছুই করছি না, আলসেমি ছাড়া। আমাদের অস্তিত্বের একটা অংশ নিজের প্রতি ক্রোধ, ঐ অংশটাই, ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে আমাকে গ্রাস করছে, টের পাচ্ছি। কেবল কামুর নোটবুক পড়ছি আর সাধ্যানুযায়ী সবকিছু পুনর্বিবেচনা করছি। বইটা যদি পড়া না থাকে, তোমার অবশ্যই পড়া উচিত, বুদ্ধদেবকেও বারবার বলেছি বইটার কথা। কলকাতায় আর যেতে দেরী আছে। যখন যাবো, জানাবো। ভালোবাসা জেনো।

১৩৮২-র প্রীতি শুভেচ্ছা ও উৎকণ্ঠা গ্রহণ করো।

১.৪.৭৬

তুমি সম্ভবত, বেঁচে আছো; যেমন আমিও, সম্ভবত বেঁচে আছি। আমরা যাইনি ম'রে আজো — তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়:/মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায়...

পর্শু, ৩রা, কলকাতায় যাবো।

ভালোবাসা জানাই।

১৩.৯.৭৭

তোমাকে চিঠি লেখার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় খবরের কাগজ এলো। — তুষার আর বেশিদিন হয়তো বাঁচবে না একথা যদিও বেশ কিছুদিন ধরেই মনে

হচ্ছিল, তবু তা'র মৃত্যুটাকে কেমন যেন absurd মনে হয়। 'বেচারা' শব্দটাও মনে আসে একই সঙ্গে। তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই হাসপাতালে যেতে পেরেছো। আমার সঙ্গে ওর শেষ দেখা প্রায় ৩ মাস আগে, তারপর, আবার ওর গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর পাই; দেখতে যেতে পারিনি — হাসপাতালে গিয়ে কাউকেই আমার দেখা হয় না। যাক্, আমাদের আরেকজন পারলো তা হলে মরে যেতে!

আমরা কেমন আছি, স্পষ্ট যেন বুঝি না আর। কিছুদিন আগে তোমার চিঠি পেয়েছি; তোমার এই চিঠিতে চমৎকার এক ভেইল পরানো আছে, যা সরিয়ে, এ ক'দিন আমি অনেকবার তোমার মুখ দেখেছি। ও, মুখের যে নির্বাক ভাষা, তাও পড়েছি, যতটুকু পড়া যায়। — ইতিমধ্যে 'উপমা' হাতে এসেছে।

শনিবার কফি হাউসে পৌঁছে শুনি, তুমি কিছুক্ষণ আগে চলে গেছো। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। ভালো আছো তো? ভালোবাসা জানাই।

অরণি-কে ৩০ টাকা দিয়েছি।

২৫.৩.৭৮

আজ শনিবার; শরীরটা এতো খারাপ লাগছে যে আজ আর কলকাতায় যেতে পারছি না। গত শনিবার যেমন দেখেছিলে, তার চেয়েও বেশ কিছুটা কাহিল হ'য়ে পড়েছি এ ক'দিনে। পর্শু সুহাসবাবুর কাছে গিয়েছিলাম — সেই একই কথা, শরীর ঠিকই আছে, যা-কিছু অসুবিধে, সবই মনের। 'বনের বাঘ খায় না, মনের বাঘ খায়' — ডাক্তারবাবু হেসে একথাও বললেন। 'conversion reaction' প্রেসক্রিপশনে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন তিনি। — আবার সেই ট্রিপটানল ২৫ ইত্যাদি। ডাক্তারবাবুর চেমবার থেকে বেরোবার সময় নিজেকে ঠিক অসহায় নয়, কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে মনে হচ্ছিল। মালার শরীরও আবার বেশ খারাপ — এটা উপরি পাওনা।

কিছুকাল আগেও 'আবার সুসময় আসবে, সুস্বাস্থ্য' ভেবে নিজেকে তোয়াজ করতুম। 'হাস্যকর তোমার অতীত — হাস্যকর তোমার ভবিষ্যৎ' এই পংক্তিটা মনে পড়ছিল — এবং এর ঠিক পরের পংক্তিটাও। কেমন আছ?

তোমার বন্ধু সুব্রত

উল্লেখ

ব্যক্তিরা : কমলকুমার মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরণি বসু, নির্মাল্য আচার্য্য, বিনয় মজুমদার, সুনীল গাংগুলি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, তুষার রায়, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, রুমনি-রুদ্র (সন্তান দ্বয়) ও মালা চক্রবর্তী (স্ত্রী), ড. সুহাস দত্ত।

পুরী সিরিজ : উৎপলকুমার বসুর কবিতার বই/ তোমার বই : শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা/গল্প কবিতা : ১৭ ডি সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ১২। সম্পাদক কৃষ্ণ গোপাল মল্লিক/ইন্দ্রদার দোকান : সুবর্ণরেখা, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৯/উপমা : সম্পাদক নীলোৎপল মজুমদার, ২১১ নেতাজী কলোনী, কলকাতা - ৫০।

ছো ◆ টো ◆ গ ◆ ল্প

ক্রম ও যম

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

আকৈশোর ভোগে সংযমী। তাই অদ্যাবধি, অশীতিপর হইয়াও আমি প্রৌঢ়ত্বে মনোরমা ব্রীড়াবতী ভার্যাকে পার্শ্বে সুপ্ত দেখিতে-দেখিতে, দেখিতে-দেখিতে ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করি। এই সময় আমার ভগবান শাক্যসিংহের ন্যায় অনুভূতি হয়, মনে হয় এই বুঝি মহাপরিনির্বাণে চলিলাম — এই আমার মহাভিনিষ্ক্রমণ। কোন যুক্তিতে সঠিক জানা নাই, এই মুহূর্তে আমার এও মনে হয় ভার্যা সুপ্তাবস্থাতেই সর্বাধিক সুন্দরী, তন্দ্রাবধি মার্জনীয়া, আর জাগরণে...। থাক। সম্প্রতি আমার ভার্যা তাঁহার কৈশোরের ব্রীড়া ফিরিয়া পাইতেছেন দেখিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলেও ইন্দ্রিয়স্বার্থ চরিতার্থে আর এতদ্বিষয়ে আমার অকপট স্বীকারোক্তি ভবিষ্যতে আমার জীবনীকে কৌলিন্য দান করিতে পারে। আজ শয্যাত্যাগের মুহূর্তে দেখিলাম অর্ধাঙ্গিনী তন্দ্রাবেশে স্খলিতবসনা হইয়া অনুপম বিরলদন্ত হাসি বিকীর্ণ করিতেছেন — তাঁহার দৃশ্যমান গ্রন্থিসকল দোদুল দুলিছে। এ সময় আমি বিচলিত হইতে পারি না, কারণ এক্ষণে আমার তথাগত ভাব। অতএব, আত্মলব্ধ প্রতিশ্রুতিতে তাঁহাকে যশোধরাবৎ ত্যাগ করিয়া এখন আমি নিমদাঁতন সন্ধান করিতেছি — আমি ভীমরতিতেও এতদূর জিতেন্দ্রিয়।

আমার দাঁতনের পদ্ধতি কিঞ্চিত অদ্ভুত। নিমডালের চোকলা কাটিয়া আমার সমবয়সী ভৃত্যবন্ধু ভারবি তাহা পূর্বরাত্রে কোহলে চুবাইয়া রাখে। আমি খলনুড়িতে তাহা পিষিতে-পিষিতে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকি। অনুধাবন করি পিষনক্রিয়ার সহিত ভক্তির গভীর সম্বন্ধ আছে। আজ আমার কিঞ্চিত বিপন্ন-ভাব। খলযন্ত্র হাতে থাকিলেও এবং হাত যথাবিধি স্ববশে থাকিলেও আমার পিষণক্রিয়ায় এবং ইষ্টমন্ত্রে ছেদ পড়িতেছে। মনে হইতেছে, তথাগতের মহাভিনিষ্ক্রমণের সময় পত্নী যশোধরার ক্রোড়ে শিশুসন্তান রাহুলও পরম প্রশান্তিতে ঘুমাইতেছিল এবং বিরলদন্তে দেয়ালা করিতেছিল, সন্তানঅভাবাৎ এক্ষণে আমার গৃহিণী যা করিতেছেন। আমি অদ্যাবধি আঁটকুড়। এমনকী, নানা প্রয়াসে বহুভাবে বিচলিত ও অবিচল থাকিয়াও আমি কন্যাসন্তান পর্যন্ত লাভ করিতে পারি নাই। প্রজননবিদ্যা ও রতিশাস্ত্রে আমার কিছু ব্যুৎপত্তি আছে। আমার এবং অর্ধাঙ্গিনীর শরীরমনের লক্ষণসকল দেখিয়া আমি বুঝিতে পারি আমাদের দাম্পত্য, সন্তানলাভের ক্ষেত্রে নিষ্ফল হইবার কথা ছিল না। সুশ্রুতের এক অজ্ঞাতপরিচয় শিষ্যের অদ্যাবধি অপ্রচারিত ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুঁথি হইতে জানিয়াছি, বার্দ্ধক্যের পর দ্বিতীয় শৈশবের কল্পনা বিজল্পমাত্র নয় — সে তত্ত্ব যথেষ্ট সারবান। দ্বিতীয় কৈশোর এবং দ্বিতীয় যৌবনের পুনরাগমনও সম্ভব — তবে সে যৌবনকে কার্যকর করিতে ক্ষেত্রবিশেষে মুক্তাভস্ম ও হীরকভস্ম সেবন জরুরি। ভার্যা আমার অনুমান এবং অনুমানপ্রসূত এক্সপেরিমেন্ট সফল হইবার সমস্ত ইঙ্গিত ও লক্ষণ ক্রমে অঙ্গে ধারণ করিতেছেন, যদিও গর্ভ এখনো বর্ষার দোলমঞ্চের মতো খাঁ-খাঁ করিতেছে। তবে আশা আছে। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের কথা মনে পড়ে — আশাই সেই রঙিল কাচ যাহাতে জগৎ সুন্দররূপে বিম্বিত হয়। নিম্বকাষ্ঠ যথাবিধি পিষ্ট হইয়াছে; এইবার দাঁতনক্রিয়ার সাড়ম্বর সূচনার শুভলগ্ন।

২

শ্রী দ্বিজনাথ সান্যাল আমার প্রতিবেশী ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আমার গৃহিণীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ আছে। তিনি পেশায় কবিরাজ ও স্বভাবে রসরাজ। তন্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার বিস্ময়কর। বিপত্নীক হইবার পর বর্ণপরিচয় ধরিয়াছেন, তবে লাতিন ভাষার। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে হাঁকিনী, ডাকিনী,

লাকিনী ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত প্রেতলোকবাসীদের সহিত কেলতিক জাদুবিদ্যার সংযোগ সম্পর্কে তিনি একটি যুগান্তকারী গবেষণাগ্রন্থ রচনা করিবেন। বলিতে দ্বিধা নাই, দ্বিজনাথ এমন প্রতিশ্রুতির যোগ্য। স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি মধ্যযুগীয় সন্ত সাহিত্য লইয়া মাতিয়াছিলেন। আমার পত্নীর সাহচর্য তাঁহাকে পুনরায় অমরুশতকে ফিরাইয়াছিল। বন্ধুবর সান্যালের সুযোগ্য সন্তান শ্রীমান অশ্বিনীপ্রসাদ ফরাসী দেশে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছে বলিয়া আমাদের গর্বের সীমা নাই। পিতার সহিত তাহার সম্পর্ক বন্ধুবৎ — দ্বিজনাথ 'প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে...' শ্লোকের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলেন। অশ্বিনী তাহার পিতাকে এক বিচিত্র বৃত্তান্ত জানাইয়াছে। গত বৎসর ব্রাউন সিকুর্দর্দ নামের এক ফরাসী বিজ্ঞানী যৌবন পুনরুদ্ধারের এক বিচিত্র গবেষণার কিস্সা শোনাইয়া বিজ্ঞানীসমাজকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছেন। শ্বাপদকুলশিরোমণি কুকুরের টেস্‌টিস বিচূর্ণ করিয়া সেই এক্সট্রাক্ট তিনি বাহাত্তর বৎসর বয়সে নিজের দেহে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশাতীত ফল পাইয়াছেন। তিনি দাবি করিয়াছেন তাঁহার প্রকল্পে কর্মরতা জুনিয়র সায়েন্টিস্ট একবিংশবর্ষীয়া আইরিশ লেডি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর পুনর্লব্ধ হৃতযৌবনের ফল হাড়ে-হাড়ে ভোগ করিয়াছেন (অবশ্য উভয়েরই সম্মতিক্রমে) এবং অবিলম্বে গর্ভবতী হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমে বিশ্ববিজ্ঞান যেন শতসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে এবং পশ্চিম গগনই তাহার লীলাক্ষেত্র। জীববিদ্যার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহবশত ডর্বিন, ওয়ালেশ, মেন্ডেল, মর্গান প্রভৃতি জ্ঞানযোগীর গ্রন্থসকল যথাসাধ্য পাঠ করিয়া মনে হইতেছে আর মাত্র এগারো বৎসর পর বিংশ শতাব্দীকে আমাদের বিজ্ঞানের শতাব্দী বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে।

৩

দাঁতনক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। মুখরুচি পূর্ববৎ। পরবর্তী প্রাকৃতিক ক্রিয়া আদিম ও সনাতন। জীবমাত্রেরই নিয়তি, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ সকলেরই। আহার করিয়া থাকে বলিয়াই সকল জীবকে ভুক্তাবশেষ ত্যাগ করিতে হয়। আমি কোষ্ঠকাঠিন্যের পেশাদার রোগী। কবিরাজি মতে সকলপ্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য ও যথাবিধি সকল প্রকার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এই সব অভিজ্ঞতার প্রেরণায় আমি কোষ্ঠকাঠিন্যকে আর প্রাতঃকৃত্যকে নেহাত মলত্যাগপ্রণালী বলিয়া অবহেলা করিতে পারি না। প্রাতঃকৃত্যের প্রেরণা, ইতরজনে যাহাকে বেগ বলে, আমি তাহাকে বলি বাহ্যজ্ঞান। বাহ্যজ্ঞানতাড়িত মুহূর্তে আমি যে আসনভঙ্গি গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা বহু ট্রায়াল ও এরর্-এর ফল। কামকলার ন্যায় এই আসনভঙ্গিতে বহু রম্য জল্পনার জন্ম হয়। বন্ধুবর দ্বিজনাথ সান্যাল ঘটনাচক্রে একদিন এই অবস্থায় আমাকে দেখিতে পান। ইংরাজি দৈনিকের এডিটোরিয়াল পড়িতে-পড়িতে বলিয়াছিলেন ইহাতে কুম্ভক ও রেচকের সোনায় সোহাগা হইয়াছে। সোহাগা শব্দের উচ্চারণে বিশিষ্টতা ছিল।

ফরাসী বিজ্ঞানীর গবেষণা বৃত্তান্ত আমাকে যথেষ্ট বিচলিত করিয়াছে। আমি ইহার সহিত প্রাচ্যচিকিৎসাদর্শন ও পুরাণ-কথিত নানা প্রসঙ্গের গভীর সম্পর্ক অনুমান করিতেছি। শিবের জন্মপ্রসঙ্গ আমায় সর্বাধিক উত্তেজিত করিয়াছে। তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ং আপনার স্রষ্টা — তাঁর জন্মের জন্য পিতামাতার প্রয়োজন হয় নাই। শিবের জীবনের কতকগুলি ঘটনাও বিশেষ সঙ্কেতবাহী। তিনি যে কামোত্তেজিত হইয়া যথায় তথায় বিন্দুপাত করিতেন তাহা তো নারীগর্ভে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বহুক্ষণ সজীব থাকিত! মনসার জন্মবৃত্তান্ত মনে পড়ে। পাশ্চাত্য পুরাণেও এমন কল্পনা বিরল নহে, দেবাদিদেব জিউস দিওনুসসকে উরুতে ধারণ করিয়াছিলেন। আঁটকুড় নাম ঘুচাইবার জন্যে আমাকে হয়তো ফরাসী বিজ্ঞানীর গবেষণার সহিত পুরাণের এক মনোজ্ঞ ঘোঁট পাকাইতে হইবে।

৪

দ্বিজনাথ আসিয়াছিলেন। আমার মনের অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়াছি। ইহা যে ঠিক বাৎসল্য, তাহা নহে। হয়তো বয়সবিশেষের একপ্রকার বিকার মাত্র। তিনি প্রথমে একটি অজ্ঞাতপরিচয় কবিরাজি পুরিয়া এবং অনতিবিলম্বে কিছু পরামর্শ দিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছি বন্ধুবর স্বয়ং যথেষ্ট উত্তেজিত। চরক, সুশ্রুত, জীবক তাঁহার অধিগত। তিনি সতর্ক ও বীতশোক-ভয়ক্রোধ-অনুদ্বিগ্নমনা হইবার অ্যাক্টো করিলেও আত্মবিস্মৃত হইয়া বিজবিজ করিতেছেন। তাঁহার অধরোষ্ঠে নানান কিসিমের হাস্যবুদ্বুদ-ভ্রূকুঞ্চনে দ্রাবিড় নৃত্য অধোমুখ হইতে পারে। বসনে অদৃশ্য প্রত্যঙ্গের কথা জানি না, তবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষত হাতের অঙ্গুলিসকলে নানান বিভঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে। কী যেন বলিতে যাইয়া বারংবার তিনি আত্মসংবরণ করিতেছেন। আমি মজা দেখিতেছি। এক্ষণে আমার ভৃত্যবন্ধু র-টি ও দেশি বিস্কুট লইয়া আসিয়াছে। এই বিস্কুটকে সাধারণে নেড়ো বলিলেও ইদানীং কেহ-কেহ কংগ্রেস্ বিস্কুট বলিতেছেন। এই অবস্থাটি আমার পরিবারে প্রাত্যহিক ফেউয়ের ডাক — বুঝিলাম গৃহিণী শয্যাত্যাগ করিয়াছেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার পদধ্বনি শোনা যাইবে। তিনি আসিবেন এবং বৈঠকখানার দরজায় শালভঞ্জিকার ন্যায় মনোরম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া ঠাকুরপো দ্বিজনাথের নিকট জানিতে চাহিবেন গতরাত্রে তাঁহার সুনিদ্রা না হইবার সম্ভাব্য কারণ কী! দ্বিজনাথ আমার স্ত্রীর চিকিৎসায় আমোদ পাইয়া থাকেন। বিশেষত বিবাহিতা স্ত্রীলোক বীতনিদ্র শুনিলে তিনি পুলকিত হন — চরক-সুশ্রুত-কালিদাস-ভবভূতি তাঁহার জিহ্বায় ভর করেন। মাঝে-মাঝে অমরুশতকের মার্জিত তর্জমাও উদ্‌গীর্ণ হয়। বুঝিতে পারি বিপত্নীকের লক্ষণ কেমন।

আমার পত্নী যথানিয়মে দ্বিজনাথকে নয়নলীলায় পীড়িত করিতেছেন এবং একটি কৌচে দেহলতা এলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কৌচ নির্বাচনের রাজনীতি চাণক্য ও মেকিয়াবলিকে কাত করিতে পারে। উক্ত নির্বাচন হইতে আমি বুঝিতে পারি এক্ষণে তিনি আমার প্রতি কোন ভাব পোষণ করিতেছেন। যদি তাঁহার নির্বাচিত কৌচটির দূরত্ব আমার এবং দ্বিজনাথের কৌচদুটির মধ্যবর্তীস্থানে থাকিয়া আমার দিকে হেলিয়া থাকে — তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি মহাবিদ্যার কোন রূপটি বিরাজমান। আমার কৌচের সহিত তাঁহার কৌচের দূরত্বের ভিত্তিতে দশমহাবিদ্যার নূতন সংজ্ঞা নির্ণয় করা যাইতে পারে। নিকটে থাকিলে বেনেভোলেন্ট বগলা এবং দূরত্ব বাড়িতে থাকিলে শেষাবধি ম্যালিগন্যান্ট ছিন্নমস্তা হইয়া ওঠাও বিচিত্র নহে।

ছিন্নমস্তার অনুষঙ্গ মনে আসিতেই মনশ্চক্ষে গৃহিণীর সেই দিব্যমূর্তি প্রত্যক্ষ করিলাম। তবে চিন্তাস্রোত এখানেই থামিয়া রহিল না। মনে তত্ত্বের উদয় হইল। ছিন্নমস্তার মুণ্ড দেহবিচ্ছিন্ন হইবার পরেও রক্তপান করিতেছিল। অর্থাৎ সেইক্ষণে ছিন্নমস্তার ধড় ও মুণ্ডকে দুইটি স্বতন্ত্র জীব বলা যাইতে পারে। জ্ঞানসংহিতায় পড়িয়াছি শিব ব্রহ্মাকে বলিতেছেন —

'হে ব্রহ্মণ! তোমার দেহ হইতে আমারই মতো তেজোময় পুরুষের জন্ম হইবে। তাহার নাম হইবে রুদ্র। আমার অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করায় আমার সহিত তাঁর শক্তি পৃথক হইবে না। আমি যে তিনিও সে।'

সন্তানসৃজনের আবেগের এই তো মূল কথা। দ্বিজনাথকে একাদিক্রমে বেশ কিছুক্ষণ একা পাইতেছি না যে এই নবলব্ধ অনুভূতি তাঁহাকে জানাইব। গৃহিণী নানান ছলনায় তাহাকে টেমপোরারি ভেড়া করিয়া কামিখ্যে লীলা দেখাইতেছেন। এক্ষেত্রে ছলনার ভদ্রেতর পরিভাষা ছেনালিও প্রয়োগ করা যাইত। গৃহিণীর আকস্মিক এই কৈশোরোদ্‌গম ও প্রগল্‌ভতায় দ্বিজনাথ যারপরনাই বিস্মিত। তিনি নূতন করিয়া বাৎস্যায়ন পড়িতেছেন। কৌশলে বিদ্বান পুত্রের নিকট হইতে পত্রযোগে জানিয়াছেন মেনোপজ যৌবনের অস্তালগ্নের একমাত্র সূচক নহে। মেনোপজ আমার গৃহিণীর ক্ষেত্রে পজ না থাকিয়া নানা পোজ্ শিখাইয়াছে। শয্যালীলায় তিনি লীলাময়ী হইয়া উঠিতেছেন। দ্বিজনাথ সৌজন্যবশত বিস্তারিত প্রশ্ন করিতে না পারিলেও ছোঁক-ছোঁক করেন। আমার নিকট আমার দাম্পত্যের নবপর্যায়ের অনুপুঙ্খ জানিতে চান। আমি জলবিছুটির মতো নানান তত্ত্বকথা তুলিয়া রহস্য করিতে থাকি। দ্বিজনাথও ছাড়িয়া কথা কহেন না। তিনি আত্মগতভাবে চরকসংহিতার সূত্রস্থান হইতে নানান জটিল উদ্ধৃতি দিতে থাকেন। আমি সম্মুখে সশরীরে উৎকর্ণ হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও তিনি বোঝাতে চান তিনি যেন অন্যমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। আসলে আমাকে প্ররোচিত করিয়া আমার প্রতিক্রিয়া মোচন করাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু যেমন বুনো ওল তেমনি শার্দুলবিক্রীড়িত তিন্তিড়ী। আমি অমৃতবাজারের কংগ্রেসের খবরের আড়াল হইতে চোখ ত্যারছা করিয়া অলক্ষ্যে তাঁহাকে মেঘনাদবৎ অবলোকন করিতে থাকি। দ্বিজনাথ বলিতেছেন, 'শুক্রবেগ ধারণ করিলে লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে শূলবৎ বেদনা, অঙ্গমর্দ, হৃদয়ে ব্যথা এবং মূত্রের বিরুদ্ধতা হয়।' আমি আতঙ্কিত ও যুগপৎ শিহরিত হইলেও এডিটোরিয়াল পড়িতে থাকি।

৫

আমাদিগের প্রায় বাল্যবিবাহ হইয়াছিল বলা চলে। বিবাহকালে আমার বয়স ছিল বিশ বৎসর, গৃহিণী সবে একাদশী। যথাক্রমে বিশ ও একাদশ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহিত জীবন প্রথমাবধি নয়-ছয়। অর্থাৎ একুনে হইল কিনা পনেরো আনা। অবশিষ্ট এক আনির সন্ধান আমি অদ্যাবধি পাই নাই। এই সন্ধান আমাদের উভয়েরই অন্বিষ্ট বলিয়া আজিও আমাদের স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিতে হয় না। বিবাহ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে এইরূপ। বিবাহের পর প্রথম দুই বৎসর পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য থাকিলে বড়ো মধুময়। আমার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একাদশ বৎসরের দেহে কিঞ্চিৎ অপুষ্ট থাকিলেও স্বভাবে ইঁচড়ে পাকা হওয়ায় গৃহিণী বিবাহিত জীবনের গুহ্যবৃত্তান্ত সম্যক অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার দুই বৎসরের অগ্রজা সহোদরা বাল্যবিধবা বৃন্দা, আমার একমাত্র শ্যালিকা—অদ্যাবধি আমার প্রধান সহায়। শ্যালিকার মধুময় সান্নিধ্য ব্যতিরেকে আমাদের জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতে পারিত। বৃন্দা সুশিক্ষিতা, সর্বার্থেই। ন্যায় হইতে শৃঙ্গারশতক পর্যন্ত কার্যকরী জ্ঞান তাঁহার আয়ত্তে, এমনকী খানিক হোমিওপ্যাথিও তিনি জানেন। আমার অকালপ্রয়াত ভায়রাভাই সাত বৎসরের বধূকে পাইয়া বিদ্যাদানের খেলায় মাতিয়াছিলেন ও সুন্দরকে ঈষৎ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে ঠেলা সামলাইতে না পারিয়া বিবাহের ছয় বৎসরের মধ্যে লোকান্তরিত হন। তাঁহার শিক্ষার ফল ফলিয়াছিল। বৃন্দা শোক করেন নাই এবং মাছ খাওয়া ছাড়েন নাই। শুভ্র বসনে তাঁহাকে সুন্দর মানাইত — শুধু সিন্দুরের পরিবর্তে তিনি চন্দন ধারণ করেন — তাহাতে তাঁহার আবেদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আজিও সেই শুচিস্মিতা মনোরমা। আমার গৃহিণী ললিতার লালিত্য যথেষ্ট — তবে সহোদরার ন্যায় বিদ্যার দীপ্তি নাই বলিয়া যথানিয়মে তিনি ঈষৎ জংলি, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে সেই আরণ্য-ভাব বড়ো প্রীতিকর হইয়া থাকে।

৬

পূর্বেই জানাইয়াছি বাৎসল্যবোধের তেমন প্রকোপ আমি কোনোকালে বোধ করি নাই। কিন্তু বৃন্দা তাঁর স্বীয় বিদ্যা ও ব্যক্তিত্ববলে ফার্নিচার হইয়া যাওয়া সেগুনে মঞ্জরী গজাইয়াছেন। আমি অনুধাবন করিয়াছি সন্তান বড়ো সুন্দর। বলিয়া রাখা অবশ্য-কর্তব্য, বৃন্দা কখনও বংশরক্ষার যুক্তি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার বক্তব্য স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সন্তান আবশ্যক নহে। এই যুক্তি জ্ঞানীর নয়, প্রিয়ার—অতএব শিরোধার্য। আজ সকালে ডেস্কে বসিয়া দেখি সেনগুপ্ত কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয় ভাষান্তরিত চরকসংহিতা গ্রন্থখানি আমার ডেস্কে রাখা। সত্তর নং কলুটোলা স্ট্রিট নিবাসী দীননাথ দত্ত দ্বারা ধন্বন্তরি স্টিল মেশিনে মুদ্রিত এই গ্রন্থখানি বৃন্দার পিতৃস্মৃতি। উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিয়া সে স্বহস্তে গ্রন্থখানি আমাকে উপহার দিয়াছে। বিস্মিত হইয়া দেখি গ্রন্থখানির স্থানবিশেষে পেজমার্ক করা রহিয়াছে এবং পংক্তিবিশেষ লোহিতরাগরঞ্জিত—বৃন্দার অধোরেখচিহ্নিত করিবার পদ্ধতি বড়ো মনোরম। তাঁহার হস্তাক্ষর ঈষৎ কাঁপা-কাঁপা, সুমেরীয় কীলকাকৃতি অক্ষরের ন্যায় আপাত নির্মম ও তেমনই অব্যর্থভাবে সারবান। আন্ডারলাইন করিবার সময় তিনি ঈষৎ বিমনা হন বলিয়া তাহা তরঙ্গিত হয়। বৃন্দার অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য পংক্তিগুলির অংশবিশেষের উদ্ধৃতি যথেষ্ট হইবে — 'রমণকালে স্ত্রী ন্যুব্জ বা পার্শ্বগত হইয়া শয়ন করিবে না, কারণ ন্যুব্জভাবে শয়ন করিয়া রমণ করিলে বায়ু বলবান হইয়া যোনিকে পীড়িত করে অর্থাৎ বীজ গ্রহণ করে না...'। সহোদরার সহিত আলাপচারিতায় বৃন্দা গুহ্য প্রসঙ্গ জ্ঞাত হইয়াছেন এবং তাঁহার বিবেচনায় বিধেয় নির্দেশ হয়তো প্রকারান্তরে জানাইয়াছেন। আমি তার কিছু ইঙ্গিত পাইয়াছি। কিন্তু ক্ষেত্র ও বীজের যে যোগাযোগ গর্ভাধানের জন্য প্রয়োজন তাহাতে পাত্র-পাত্রীর অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার এবং গৃহিণীর কোনো অজ্ঞাত অভাব আছে যাহার নিরাময় আমি ও বন্ধুবর সান্যাল বহুকালের যৌথ প্রয়াসে করিতে পারি নাই। বৃন্দার উপদেশ শিরোধার্য—চরক যেন তাঁহার কান্তাসম্মিত চিন্তা ও হস্তস্পর্শপূত হইয়া গীতগোবিন্দম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। হয়তো যবনবিজ্ঞানীর গবেষণাই আমার অন্বিষ্ট।

৭

দ্বিজনাথের পুরাণজ্ঞান প্রসিদ্ধ। তিনি সেদিন আমাকে ঋভুগণের বৃত্তান্ত পাঠ করাইয়াছেন। ঋভুগণ দ্বিতীয় শ্রেণির দেবতাবিশেষ। ত্রিদেব অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কৌলীন্য এঁদের নাই। এঁদের গণদেবতা বলা যাইতে পারে। এঁরা এক মহৎ কার্য করিয়াছিলেন। বৃষকাষ্ঠের ন্যায় বিশুষ্ক, বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতামাতাকে এঁরা যৌবন দান করিয়াছিলেন এবং তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এই কার্য করিতে গিয়া তাঁরা যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর ন্যায় অবিমৃষ্যকারী আচরণ করেন নাই। তাঁদের নিজেদের রূপযৌবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাঁরা পিতামাতার যৌবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। দ্বিজনাথের বক্তব্য এঁরা আয়ুর্বেদ জানিতেন। রক্তবীজের প্রতি রক্তকণাই যেমন আর এক রক্তবীজের উৎসমূল তেমনি ঋভুগণ নাকি শরীরের কোষ-বিশেষকে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা সঞ্জীবিত করিতেন যাহাতে সেই কোষ হইতে একটি পূর্ণাবয়ব প্রাণসমৃদ্ধ শরীর তৈয়ারি হওয়া সম্ভব হয়। যবনবিজ্ঞানীদের মধ্যে নাকি এমন মতের সূত্রপাত ঘটিতেছে। দ্বিজনাথ লোকায়ত প্রাচ্য উপমায় কথা কহিতে পছন্দ করেন। তিনি বলেন এ বিষয়টি কলমের গাছের মতো। উপযুক্ত ডাল কাটিয়া যথাবিধি পরিচর্যা করিলে বিচ্ছিন্ন ডাল থেকে উৎস তরুটির মতো আর একটি পূর্ণাবয়ব তরুবর সৃষ্টি হইতে পারে। যদি এই প্রণালী মানবদেহে কার্যকর করা যায় তাহা হইলে আমার বা গৃহিণীর উর্বরতাশক্তি লইয়া মাথা ঘামাইবার আর তেমন প্রয়োজন থাকে না। যদিও আমার জানা নাই সেক্ষেত্রে সন্তানকামী দম্পতিবে ঠিক কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে। বৃন্দা শুধু এইটুকু ইঙ্গিত দিয়াছে যে ধাত্রী ও স্তন্যদায়ীর দায়িত্ব তার। ধাত্রীবিদ্যায় তাহার পারদর্শিতা বিস্ময়কর। স্তন্যের প্রসঙ্গে আমি সংশয় প্রকাশ করায় সে বলিয়াছে বাৎসল্য জাগ্রত হইলে স্তনগ্রন্থি সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং সে জন্য স্বতন্ত্র শারীরক্রিয়ার কোনো প্রয়োজন নাই।

৮

দ্বিজনাথকে বৃন্দার বৃত্তান্তসকল জানাইতে তাঁহার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। তিনি অকস্মাৎ জানিতে চাহিয়াছেন ডাকিনীবিদ্যায় আমার কোনো আস্থা আছে কিনা।

প্রত্যুত্তরে আমি অধরোষ্ঠ কঠিন করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করায় তিনি থতমত খাইয়া কহিয়াছেন, ডাকিনীর সহিত বৃন্দার কোনো সম্পর্ক নাই এবং এ প্রসঙ্গ নিতান্তই এক সমাপতন। ইহার পর তিনি তাঁহার বক্তব্য বিশদ করিয়াছেন। ডামরতন্ত্রে নাকি জীবিত ব্যক্তির দেহের অংশবিশেষ হইতে অপত্য সৃজনের অপরাসায়নিক প্রক্রিয়ার নির্দেশ আছে। তবে সে বৃত্তান্ত অতি গুহ্য। এ কাজে সাধনসঙ্গিনীর আবশ্যক এবং সঙ্গিনীকে অতি উন্নত আধার হইতে হইবে। দ্বিজনাথ মিলাইয়া দেখিয়াছেন আমার স্ত্রীর মধ্যে উপযুক্ত আধার হইবার সমস্ত গুণই সগুণে বর্তমান। যদিও আমার স্বীয় মতামত এই যে, এক্ষেত্রে দ্বিজনাথের বক্তব্যে অযৌক্তিক পক্ষপাত থাকিতে পারে। কিন্তু একটি জায়গায় বিশাল বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সাধনপ্রণালীর দাবি অনুযায়ী সাধনসঙ্গিনীর শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নয়, রীতিমতো বিদুষী হওয়া প্রয়োজন। এ কথা শুনিবামাত্র আমি রিফ্লেক্সের তাড়নায় বলিয়া বসিয়াছি — 'এ বৃন্দা, এমন বিদুষী আর...' বলিয়াই দ্বিজনাথের মুখে মনোরম নষ্টামিতে পরিপ্লুত হাসি দেখিয়া বুঝিয়াছি আমার মনোবাঞ্ছা বুঝিতে তাঁহার বাকি নাই। অবশ্য স্বাভাবিক চারিত্রিক সম্ভ্রমবশত তিনি গাম্ভীর্য কয়েক তার বাড়াইয়া কম্প্রকণ্ঠে বলিয়াছেন, 'জানিতাম তোমার আপত্তি থাকবে না।' আমার গৃহিণীকে সমস্ত অবস্থা সামলাইয়া বুঝাইবার দায়িত্ব তিনি সর্বাঙ্গ পাতিয়া লইয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার অতিরিক্ত ঔৎসুক্য দেখিয়া আমি যথাসময়ে নষ্টামি-হাসির যথোচিত জবাব দেওয়ায় তিনি স্কুলবয়ের মতো ব্লাশ করিয়াছেন।

৯

তিথি নক্ষত্র জানাইতে বাধা আছে। শুধু এইমাত্র জানাইলাম যে অদ্য সেই রজনী। যবনবিজ্ঞানীর গবেষণার ইঙ্গিত, চরকসংহিতা, ডামরতন্ত্র ও সর্বোপরি বৃন্দার অনুপম মনীষার সহায়তায় সাধনাক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার বিশদ বিবরণ অনাবশ্যক। পুঁথিতেও কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। সস্ত্রীক আমি, বৃন্দা ও দ্বিজনাথ আমার পৈত্রিক ভদ্রাসনের একটি নির্জন কক্ষে খেলাঘর সাজাইয়াছি। দ্বিজনাথ ব্যতীত কাহারও শরীরে বস্ত্র নাই। স্বভাবত বেহায়া আমার সহধর্মিনী এই প্রস্তাবে মারমুখী হইয়াছিলেন। দ্বিজনাথের সরস যুক্তি ও বৃন্দার টীকাটিপ্পনীতে তিনি আশ্বস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বাত আছে বলিয়া পদ্মাসন নিষেধ, বৃন্দার পরামর্শে তিনি ভ্রূকুটি করিয়া বজ্রাসনে বসিয়াছেন। বৃন্দা ও আমি পদ্মাসনে স্বচ্ছন্দ। দ্বিজনাথ উতলা নেউলের মতো ক্ষিপ্রপদে ও সতর্ক নয়নে ঘুরঘুর করিতেছেন।

এই বয়সে শুক্রবিন্দু নিঃসরণ অতিশয় দুরূহ। গৃহিণী ও বৃন্দা উভয়েই এ ক্ষেত্রে আমাকে স্ব-স্ব চরিত্রানুযায়ী যথোচিত সহায়তা করিয়াছেন। প্রথমে শুক্রবিন্দুতে পুংসবন করিবার প্রস্তাব গৃহিণী দিয়াছিলেন এবং দ্বিজনাথও এক্ষেত্রে তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। বংশপ্রদীপ বলিতে তাঁহারা পুত্রসন্তানই বুঝিয়া থাকেন। আমি নতমুখ নির্বাক বৃন্দার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিবাদ করিয়াছি। এ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক নিয়মকে যৎপরোনাস্তি লঙ্ঘন করা হইতেছে। অন্তত সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃতির পবিত্র অনিশ্চয়তার মায়াটুকু থাক। যদি জনান্তিকে কহিতে হয় তাহলে আমার প্রার্থনা কন্যাসন্তান, বৃন্দার মতো... প্রিয়শিষ্যা, ললিতে, কলাবিধৌ...।

আমার ও গৃহিণীর দেহের নানাবিধ রসে প্রস্তুত মিশ্রণটি বৃন্দা পান করিতে উদ্যত। ইহার পূর্বে তিনি দম্পতিকে স্পর্শ করিয়া অনুপম কণ্ঠে একটি প্রাচীন পুঁথি পাঠ করিতেছিলেন। আমার অসহায় নিরক্ষর গৃহিণীর বারান্তরে পাঠরতা বৃন্দা ও দ্বিজনাথের দিকে চাহিতেছিলেন। দ্বিজনাথের নয়ন হইতে সহানুভূতি ও মুখ দিয়া নাল গড়াইতেছিল। গৃহিণী তাঁহার প্রচ্ছন্ন ভক্তের এই নীরব সান্ত্বনায় কতটা শীতল হইতেছিলেন জানি না, কিন্তু বৃন্দা যখন দেহরস মিশ্রণ পান করিতে উদ্যত তখন তিনি শান্তিভঙ্গ করিলেন। তাঁহার বমনোদ্রেক হইল। দ্বিজনাথ শশব্যস্ত হইয়া অঞ্চলপ্রান্ত হইতে একটি পুরিয়া খুলিয়া গৃহিণীর মুখে দিলেন এবং গৃহিণী সেই পুরিয়া কপ করিয়া গিলিয়া ফেলায় ভাসুরঠাকুর করাঘাতে কপাল রাঙ্গা করিয়া বৌঠানকে জানাইলেন চিবাইলে ইহা যথার্থ কাজে লাগিত। যাই হোক, আমি ইত্যবসরে বৃন্দার মনোরম ভ্রূকুটি দুই চক্ষু মেলিয়া পান ও চর্বন করিলাম — খানিকটা গিলিলামও। যথার্থ কাজে লাগিল।

রসমিশ্রন আত্মস্থ করিবার ঘণ্টা দুয়েক পর হইতে বৃন্দার শরীরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। কবিগুরুর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-য় সরস্বতীর আবির্ভাব যেন আমার সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিল। বৃন্দা আসন হইতে উঠিয়া ভূতগ্রস্তের মতো আমার পত্নীর দিকে অগ্রসর হইলেন। আমার গৃহিণী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃন্দা তাঁহার সহোদরাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের জিহ্বা তাহার অধরোষ্ঠে স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্যমতে চুম্বন করিলেন। দ্বিজনাথ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ডামরতন্ত্র হইতে বিদঘুটে শ্লোকসকল আবৃত্তি করিতেছেন। দীর্ঘ চুম্বনের পর তাঁহারা দুইজনে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। দ্বিজনাথের কণ্ঠ হইতে দুটি সংসর্গহীন শব্দ নির্গত হইল — 'ফট্! সাফো!'

১০

খুকি হইয়াছে। দ্বিজনাথ রহস্য করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছেন ক্লোনি। নামের তাৎপর্য জানিতে চাহিলে তিনি শুধু মিটমিট করিয়া হাসেন। আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম এই নামের সহিত গার্গী বাচক্নবীর নামের কোনো অনুষঙ্গ আছে কিনা। দ্বিজনাথ আমার অনুমানের নাবালকত্বে বিস্মিত হইয়া আমাকে শুধু জানাইয়াছেন যে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পারঙ্গম। ক্লোনি নামের জ্যোতিষবিষয়ক তাৎপর্য জানিবার জন্য আমি বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নাকাল হইয়াছি। বৃন্দা এখন যমদেবতাকে তাঁহার ইষ্ট করিয়াছেন, গার্হস্থ্য পরিসরে যদিও যমপূজার বিধান নাই তবু তাঁহার মতো বিদুষীর সকল কার্যেই রম্য যুক্তি থাকে। কৌতূহল প্রকাশ করায় তিনি নিভৃত স্থানে ঠোনা মারিয়া কহিয়াছেন ওই দেবতাটি ছাড়া আর কার বাড়িই বা তাঁহার যাইবার আছে। তিনি এখন প্রতিশ্রুতিমতো দুগ্ধবতী।

পরমাশ্চর্য এই যে আমার গৃহিণী পুনরায় রজঃস্বলা হইয়াছেন। আমি একদিন তাঁহাকে বৃন্দার মতো জিভ বাহির করিয়া চুম্বনে উদ্যত হইলে তিনি হাসিয়া গড়াইতে-গড়াইতে বলিয়াছেন, ঠাকুরপো দ্বিজনাথ নাকি ঠিকই বলিয়া থাকেন। দ্বিজনাথ তাঁহাকে অনেক কিছুই বলিয়া থাকেন এবং এত কিছু বলিলে অবশ্যই কিছু ঠিকও বলেন। আমি গৃহিণীকে আর ঘাঁটাইবার চেষ্টা করি নাই। দাম্পত্যের বাড়াবাড়িতে আমি রাত্রে আফিং ধরিয়াছি কিন্তু দিবানিদ্রার সাধ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঈষৎ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হইলেও দ্বিপ্রহরগুলি এখন বড়োই মনোরম। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর দ্বিজনাথকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া মিটিমিটি হাসিতে-হাসিতে গৃহিণী খসখসে জল ছিটাইতেছেন। বৃন্দার কোল আলো করিয়া ক্লোনি ঘুমাইতেছে।

একটি ছোট্ট গল্প

তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়

'বাড়িতে ক-জন রয়েছেন?' হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন। রাশভারী লোকেরা সহজ প্রশ্ন করলেও অনেক সময় কঠিন মনে হয়। কিন্তু অভীক খুব স্মার্ট। সে কখনও ঘাবড়ে যায় না। চটপট জবাব দেয়। লোকে অবাক হয়ে যায়। তার কাছে এটা কোনো প্রশ্নই নয়। আবার কোনো প্রশ্নকেই সে সরলভাবে নেয় না। কারণ প্রতিটা কথাতেই মানুষে-মানুষে তফাৎ বোঝা যায়। সে বলল, 'সাড়ে পাঁচ, টু বি এগজ্যাক্ট।'

টেবিলের ওপারে তিনজন। একজন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। একজন অন্যমনস্কভাবে অভীকের বায়োডেটাটা পড়ছেন। আর একজন মোবাইল ফোনে কিছু লিখছেন। দামী মোবাইল, নিশ্চয়ই ই-মেল করা যায়। দাম কমলে অভীক ওরকম একটা কিনবে।

'বাবা, মা, দাদা, বৌদি আর দাদার আড়াই বছরের ছেলে।'

বায়োডেটা থেকে মুখ তুলে ডান দিকের মোটাসোটা ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার বয়স যখন আমাদের ছিল, তখন আমরা সামনে অনেক দূর দেখতে পেতাম। এখন পেছনে তাকালে অনেক দূর দেখতে পাই। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, দুটো ছবিই মোটামুটি একই। অনেকটাই মিলে গেছে। আপনি প্ল্যান করে কাজ করতে পারেন, না কি অন্যে কী হুকুম করবে, তার জন্য অপেক্ষা করেন? আপনার বস যদি মহিলা হন, তা হলে আপনার কি অসুবিধা হবে? শার্টের ব্র্যান্ড আপনার কোনটা পছন্দ? রবিবার যদি আপনার ছুটি না থাকে, আপনার কি অসুবিধা হবে?' বাঁ পাশের ফুলকাটা টাই পরে যিনি বসে ছিলেন, তিনি মোবাইলের কাজ সেরে সামনে তাকালেন এবার। অভীক উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন, 'দ্য ইন্টারভিউ ইস মেন্ট টু বি রিগরাস, উই ক্যান নট অ্যাফর্ড টু বি মিসটেকেন। কালকে মি. সরকার বাংলাদেশ চলে যাচ্ছেন ওখানে আমাদের অপারেশনস্-এর ওপর নজর রাখতে।' ডান দিকের মোটা ভদ্রলোক অল্প মাথা ঝোঁকালেন অর্থাৎ তিনিই মি. সরকার। 'এইচআর-ভিপি আজ বিকেল বেলাতেই চলে যাবেন বিশাখাপত্তনম, ওখানে কিছু লোকাল ঝামেলা মেটাতে। আর আমি নিজে যাচ্ছি বেলারুশ। ওখানে একটা অ্যাকুইজিশনের কথা চলছে। ফলে বুঝতেই পারছেন, আমাদের একসঙ্গে পাওয়াটা কতটা বড়ো অসুবিধা?'

সরকার বললেন, 'জাহাজের দুলুনিতে কি আপনার কোনো অসুবিধা হয়? হলে কিন্তু এখনই বলে দিন।'

অভীক কায়দাগুলো জানে। জীবনে অনেক ইন্টারভিউ সে দিয়েছে। তাকে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা কম হয়নি। কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই তার ধাতুটা অন্যরকমের। সে বলল 'জাহাজের দুলুনিতে আমার অসুবিধা হয় কিনা, সেটা কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আপনাদের বলতে পারছি না। কারণ জাহাজে আমি কখনও চড়িনি। স্টিমারে চড়েছি, সুন্দরবন গিয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু কোনও অসুবিধা হয়নি। ফলে, আমার মনে হয়, যদিও পুরোপুরি সঠিকভাবে বলা যায় না, আমার জাহাজের দোলায় কোনও অস্বস্তি হবে না। কর্মক্ষেত্রে আমি কখনওই ছেলে-মেয়ের মধ্যে তফাৎ করি না। আমার চোখে দু-জনেই সমান। এটা আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। তিন নম্বর প্রশ্নটা ছিল রবিবার নিয়ে। রবিবার আমি কখনও সময় নষ্ট করিনি। পরিকল্পনা করেছি আগামী সপ্তাহটা ঠিক কীভাবে কোন কাজটা করব। আমি নিজের সামনেই ছোটো-ছোটো টার্গেট রেখে এগোবার চেষ্টা করেছি। আমার রবিবারগুলো আমি কখনোই হালকাভাবে নিতে পারি না। কারণ শুধু পরিকল্পনা করলেই চলে না। আগের সপ্তাহের পরিকল্পনার সঙ্গে সেই সপ্তাহের মোট কাজের নিট ফলাফলের একটা কো-রিলেশন তৈরি করতে হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই পরের সপ্তাহের প্রতিটা ঘন্টার কাজের রুটিন আমি তৈরি করি। ভুল সময় চা খেতেও যাই না। আর হিসেব করে দেখেছি, গড়ে আমার পরিকল্পনা আর তার ফলাফল মোটামুটি বিরানব্বই দশমিক দুই আট শতাংশ মিলে যায়। আশা করি আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব আপনি এর থেকে পেয়ে যাবেন। বড়ো টার্গেট যে আমার নেই, তা নয়। কিন্তু বড়ো স্কোরে পৌঁছতে গেলে প্রতিটা বলই খেলতে হয়।'

এইচআরডি-র ভিপি বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে আগে খোঁজ নিইনি বললে ভুল হবে। আমাদের এসপিওনাজ সিস্টেম খুবই ভালো। আপনার এই গুণগুলো আমরা লক্ষ করেছি। এ-ও জানি আপনার বাজারের হিসেব আপনি কম্পিউটারে রাখেন এবং সেই হিসেবের মধ্যে বাৎসরিক ইনফ্লেশনের রেটটা ধরা রয়েছে। আপনি ছাড়া আজ বাকি যে দু-জন ইন্টারভিউ দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আপনার এখানেই তফাৎ।'

অভীক মৃদু হাসল। সে জানে।

'আপনাকে বলতে বাধা নেই, অভীক। তাদের যোগ্যতা কিন্তু আপনার থেকে কোনও অংশেই কম নয়। কিন্তু তাদের একজন রবিবার মাছ ধরে অথবা ক্যারম খেলে। অন্যজন প্রতি ছুটির দিনই বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। সিনেমা দেখা হলে নাকি দুজনে মিলে ফুচকা খায় আর আইসক্রিম খায়। আর তারপর নাকি গল্প করে।'

অভীক জানে, সে ইন্টারভিউটাকে গুছিয়ে এনেছে। সরকার তাকে আর ঘাঁটাবেন না। এইচআর-এর ভিপি তাকে এখন পছন্দ করেন। বাকি শুধু অন্য জন।

অন্যজন, যিনি বেলারুশ যাচ্ছেন, তিনি বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, আমরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? আপনি যদি আমাদের কোম্পানিতে কাজ করতে আসেন, তা হলে আপনি কী চাইবেন?'

'আমি আপনাদের উদাহরণ অনুসরণ করার চেষ্টা করব। আপনাদের অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে আমার উদ্ভাবন মিশিয়ে আমি চেষ্টা করব কোম্পানির কাজ যেন কোনওভাবে ব্যাহত না হয়। কারণ কোম্পানি আর আমার উন্নতি পারস্পরিক জড়িত।'

'আমি কালকে বেলারুশ যাচ্ছি বললাম বোধহয়? আপনাকে যদি এক্ষুনি বলা হয় বেলারুশ যেতে, আপনি পারবেন?'

'এখানে যদি আমার সেভাবে জরুরি কোনও কাজ না থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই যাব।'

'আমাদের পার্টিতে খুব ভালো মদ থাকে। খুব সুন্দরী মহিলারা আসেন। আপনি নিশ্চয়ই মদ খেতে অপছন্দ করেন?'

'না। আই বেগ টু ডিফার। আমি মদ খেতে ভালোবাসি। আর সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি খুব ভালো নাচতেও পারি। কিন্তু আমি কখনও অসভ্যতা করি না।'

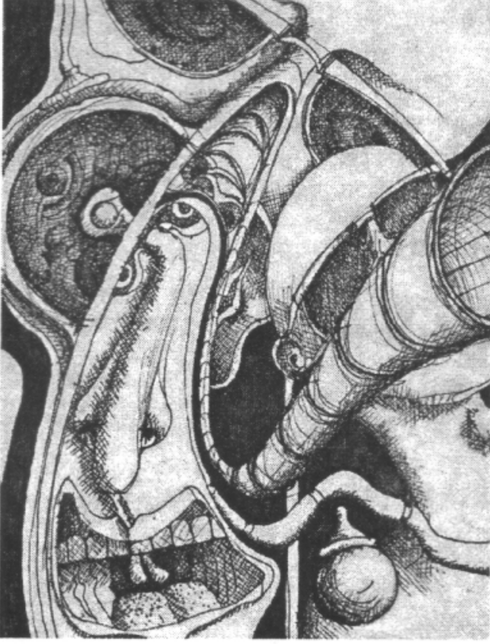
ভিপি, এইচআর, এতক্ষণ মৃদু হাসছিলেন। এবার বললেন, 'অভীক, বলতে বাধা নেই, আপনাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আমার ধারণা আপনার সমস্ত দিকগুলোকে আমরা খুব ভালো কাজে লাগাতে পারব। বাকিরাও জানি আমার সঙ্গে একমত হবেন। আপনার মাইনেতে, আপনাকে আগেই জানানো হয়েছে, একটা নব্বই শতাংশ হাইক হবে। কিন্তু কাজের প্রোফাইলটা আগের মতোই। আগের কোম্পানির প্রায় দ্বিগুণ মাইনে দেব আমরা। আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, কেন? লজ্জা পাবেন না, জিজ্ঞাসা করুন, কেন?'

'কেন?'

'আসলে আমাদের একটা মাইনর ক্লজ রয়েছে। সেটা হল, আমাদের এখানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর একটা রেস্ট্রিকশন আছে। মিনিটে আটবারের বেশি শ্বাস নিতে পারবেন না। এটা আপনার ওপর একটা এক্সট্রা ওয়ার্কলোড। একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই মাইনেটাও বাড়ছে। আপনার কি এতে অসুবিধা হবে?'

'একেবারেই না।' অভীক বলল। একটু সময় নিল। টাইয়ের ফাঁসের কাছে একবার আঙুল চালিয়ে দেখে নিল বাঁধাটা একেবারে ঠিক আছে কিনা। 'আপনারা সম্ভবত একটা জিনিস খেয়াল করেননি। আমি এতক্ষণ এখানে বসে আছি। একবারও শ্বাস নিতে দেখেছেন আমাকে?' মৃদু হাসলো অভীক। 'আসলে কিছুদিন আগে থেকে আমি খেয়াল করছিলাম, কম শ্বাস নিলেও আমার দিব্যি চলে যায়। তারপর এই গত কয়েকদিন দেখছি, একেবারেই শ্বাস নিতে হচ্ছে না। আমি জানতাম, এটা আমার একটা অ্যাডভান্টেজে পরিণত হবে।'

টেবিলের ওদিকের মানুষগুলো খুবই খুশি। তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন হাসি মুখে।



হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়

দিস্ রিলায়ান্স কাস্টমার ইজ্ নট রেসপন্ডিং

ছুঁড়ে দাও, আলোও গড়িয়ে আসুক
পুরোনো স্ট্রাইকারের মতো,
তারপর লটবহর নিয়ে আমি,
বিশ্বনাগরিক, বাঙালি মেয়ের খোঁজে
ঘুরে আসি মহেঞ্জদারো;

সেসব হাজার বছর আগের পুরোনো ঘটনা
যখন বৃষ্টি চাই। এবং গরুর করোটির মতো
নগ্ন ও অশালীন তৃষ্ণা নিয়ে
ফুটে ওঠে ছাতিমের আশ্চর্য কুঁড়ি
তখন নিজেই নিজের মধ্যে ভিজি
ওর দেহ থেকে ভিজে ওড়না তুলে নিয়ে
হাওয়াতে শুকোই; তখনও সূর্যের দেহ গ্রহণ করেনি
শুক্রের ছায়া
এখন ছুঁড়ে দাও আলো, অন্ধকারের মতো
গড়িয়ে আসুক আমার স্ট্রাইকারের দিকে।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতির আরও অনুবাদ

বিকাল-উত্তর সন্ধ্যায় আমরা জ'মে উঠতাম আড্ডায়, কথাবার্তায়; আজ
কথা শুধুই নিজের সঙ্গে। ভাস্করদা বিষয়ে, জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে
আমার কিছু বলার ছিল।
বন্ধু, তুমি কোথায়? তোমাদের শোকসভা থেকে দূরে এল এই
বর্ষার বিদায়ী বিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত...

রূপা দাশগুপ্ত

পাখিজন্ম : ১১৫

জলবদল করলেই মিটে যাবে সব
পুকুরে অনেক ঢেউ ওঠে
চালের গোগ্রাস দেখে ফিটকিরি মাছ
হাঁ হতে যেটুকু সময়
বারণ জেনেও সে পিছু ফেরে, জল
শুকিয়ে ফেলা খুব জরুরি তখন।

তারেক কাজি

ক্লান্তি

ওসব কিছুই নয়; তবু যেন কোন মন্ত্রবলে
তার কাছে ছুটে যাই।

আমার আঙুলে ভর করে নটরাজ।
বিলি কাটে চুলে,
দারুণ আবেগে তার রুদ্ধ কণ্ঠ খুলে যায়।

সে বলতে থাকে — এভাবে না, এভাবে না,
আগেরটা আবার দেখাও।

আমি মেলে ধরি সাত রং, ভূমিতল,
অপাপ আকাশ আর
জ্বলজ্বলে শুকতারা।

কিছুপর নিজেকেই যেন
তুষারের মতো হিম আর মৃত মনে হয়।

পাশাপাশি দু-জনায়,
চুপচাপ শুয়ে থাকি ঘুম এসে যায়।

অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

শরৎ

আমার কোনোদিন
কোথাও কোনোখানে
ছিল না কোনো কাজ।

নেহাতই উজবুক
ফড়িং ধরে সুখ পেয়েছি কত,
ঘাসেতে শুয়ে ঘাস খেতে
সম্মত;

আজকে বন্দরে
ছায়াতে, নোঙরে
ভিড়েছে এক সোনায় মোড়া জাহাজ!

ঠিক্‌রে আসে চোখ
চোখের বুনো পোক
দেখছে দূরে দিঘির জলে।
কমলবনের বুক-ভাঙানো সাজ।

শমিত রায়

ভ্রমণকাহিনি

১
আমাদের শস্যক্ষেত্র ভারী হচ্ছে তখন আর বন্দর পেরোলেই একে-একে আলোকস্তম্ভ পথ ও বৃক্ষসমূহ ঝুঁকে পড়ছে রাত্তিরে, পাষাণ ল্যান্ডস্কেপে। হাওয়ার জানলায় কাচ লেগে গেলে দেখা যাচ্ছে প্রায় চৌকো এক-একটি বাক্স জুড়ে কীভাবে টুপ্-টুপ্ করে অন্ধকার জ্বলে উঠছে দেখা না যাওয়ার মতো দূরত্বের দিগন্তে। একটু এগোলেই আলপথ বরাবর ডানদিকে ওত পেতে বসে থাকছে পাথর, ঠান্ডা, অনেকটা পাহাড়ের মতো ছোপ ফেলছে মাঠশেষে অন্ধকারে কালো-কালো পাহাড় বলে মনে হতে পারে বলে। ধাবা ও সীমান্তের গ্রাম থেকে হঠাৎ-হঠাৎ লণ্ঠন ছলকে মুহূর্তেকের জন্য চলে আসছে সরকারি বিদ্যুৎ আর পরের জনপদ শুরু হওয়ার কথা হলে জেগে থাকছে নক্ষত্রপুঞ্জ, স্থির ও মাটির কাছে নেবে এসেছে ভেবে।

২
ভুল করে সারা রাত্রি বাইরে মেলে রাখা হিমের চাদরের মতো শেষরাতের রাস্তা ক্রমশ পায়ের সামনে জমিয়ে রাখতে থাকে নিচু-নিচু পাহাড়। স্ট্রেইট ডাউন জাইয়ে ছাড়িয়ে একটু এগোলেই ডানদিকে থাকে-থাকে সিঁড়ি উঠে গেছে দেখা যেতে থাকে আর আরও অনেক সামনে অন ইওর লেফট সাইড ইউ উইল ফাইন্ড দ্য বোর্ড বলে মাথায় সাদা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে আগে-আগে হেঁটে যেতে থাকে নরম-নরম রাস্তা। তখনো ভোর হয়নি বলে তার রং মনে হতে থাকে বাষ্পের মতো হলুদ অথচ একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব পেতে পারেন বলে সঙ্গে দু-একটা হালকা গরম জামা বা উইন্ডচিটার রাখা ভালো।

৩
পাথুরে চাতালের মতো ছড়ানো রোদ্দুর পেরোতেই ভেসে আসে তিব্বতি গুম্ফার আদল আর অজানা বাদ্যযন্ত্র ও গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের সমবেত স্বরগুলি মনে হতে থাকে মৃদু চোখে প্রাণপণ ছুঁয়ে আছে দূরবর্তী পাহাড়ের ভিজে-ভিজে বাঁক। তাদের কাঁধে ও মেরুন পোশাকে ঝুরো-ঝুরো তুষারের স্মৃতি নিয়ে বাধ্য বালকের মতো ঠা-ঠা রোদে ছোটাছুটি করতে থাকে থাকে-থাকে পুরোনো পুঁথি ও থাংকার হলদে হয়ে আসা ভঙ্গুর বিষণ্ণতা আর বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গগুলি বৃদ্ধের মুখ থেকে আবছা গল্পের মতো বেরিয়ে এসে একে-একে ঝুলে থাকে ফ্রেমে বাঁধানো ছোটো-ছোটো দেওয়ালে। অথচ একটু দূরেই অগভীর জলে পায়ের পাতা ঈষৎ ভিজিয়ে শ্যাওলা-ঢাকা নিশ্চিন্ত পাথরেরা অদৃশ্য হাতিদের পোষমানা শিকলের শব্দে মগ্ন হয় প্রেমে ও পিকনিকে আর তাদের ঠান্ডা হাওয়া ও বুনো আমের গন্ধ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে গুম্ফার ছবিতে যেখানে চারজন আকাশপ্রতিম দেবতা তাদের সোনার অঙ্গে মেখে নেয় ভ্রমণপিপাসু মোমবাতিদের বিস্মিত চোখ আর খুলে রাখা জুতো।

৪
বিকেল নাগাদ জলপ্রপাত চলে যেতে পারেন ঠিক শহর ছাড়িয়েই যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে কফিখেত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত গোলমরিচের ঘ্রাণ আর মৃদু-মৃদু ফার্নদের শরীরে জলকণা জমে থাকা আঙুলের ঈষৎ ছোঁয়াতেই ঝরে পড়ছে টুপ্-টুপ্ মাটি ও পুরোনো পাতায়। কফি-টি-কোল্ডড্রিঙ্ক আর সিগারেটের দোকানে জড়ানো হালকা গেটের মতো বিজ্ঞপ্তি পেরোলেই দেখা যাচ্ছে ধাপে-ধাপে সিঁড়ির মতো পা নেমে গেছে বহু নীচে আর পড়ন্ত জলের শব্দে সেখানে লোহাটে ব্রিজের উপরে ঝুলে রয়েছে ভারী শ্যাওলার মতো মেমটুপিদের গান ও গল্পগাছা। ব্যাস, এখানেই এরকম বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে ইতস্তত ঘুরে দেখে নিতে পারেন জলেদের প্রকাশ্য চান ও পাথর, আর সটান বৃক্ষসকলের জলছবি-আলোয় আপনি চুপচুপে গেলে বুঝতে পারবেন স্থানীয় ড্রাইভারের চোখ এবারে চেপে বসবে উইন্ডস্ক্রিনের সরু-সরু অন্ধকার বাঁকে। রোজকার কুয়াশার পাশাপাশি তার টায়ারের দাগ ঝুঁকে ফিরবে শহরের দিকে আর সিনেমার গানের সঙ্গে তাল দিতে থাকবে লাল-কালো স্টিয়ারিং-এর খুশি-খুশি শিস।

বিশ্বজিৎ পাল

শ্বাসরুদ্ধ

বিদ্যাসংকটের পাশে, দুপুরের শ্লথগামী মেয়েদের
অনাবশ্যক নীচে নামবার সাহস হয়েছে

কালগহ্বরের অতল অবধি চলে গেছে
ঘুড়িদের আধিপত্যের লড়াই

'এখন যাবার কথা' — অনুচিত জটিলের
পিঠে চেপে, ধাক্কা মারছে অবরুদ্ধতায়

এইতো সময় আজ, বিপন্নতা শুয়ে আছে—
মাথা নিচু, বাঁকা ঘাড় — হর্ষের তলায়...

সোমেশ ভট্টাচার্য

কৃষ্ণকণিকা

সন্ধের অন্ধকার দেবালয় স্বভাবত ভয়ঙ্কর দেখায়
তখন
ঈশ্বর তুমি মানো বা না-ই মানো

ভয় পাবে
যদি সন্ধ্যার রথ আঁধারে দাঁড়িয়ে তার শরীর
ভেজায়, এইসব দুর্গা

আমাদের কৃষ্ণকণিকায় থাকে — লাবণ্যে স্থির
জুতোচোরও থাকে, তারা আশেপাশে লুকিয়ে দাঁড়ায়

জয়িতা দাশগুপ্ত

যুদ্ধ-বিরতি

সাম্প্রতিক অসম্ভাব, ভাবছি আমি, তুই-ও ভাব
অতীত শুধুই অলীক চোরা রাস্তাঘাট!
খোঁচায় খোঁচা — প্রমাণ হোক, রক্ত নেই; এ নির্মোক
ফেরাতে চাওয়া রাজনীতির সহজ পাঠ...

ধ্বস্ত দিন; স্তব্ধ রাত স্তব্ধতায় রাখলে হাত
প্রেক্ষিতের অন্যতর অর্থ হোক।
এই সকল সঙ্কেতে, প্রত্যাশিত রং পেতে
উদ্‌যাপন প্রাজ্ঞ প্রতিবর্ত-শোক।

সোমব্রত সরকার

পলক

দৃশ্যের মহিমা কেঁপে ওঠে সেই

পাতার ফাঁকে চাঁদ পড়লে
নিদারুণ জুতসই

যদিও বাঁশবাগান নেই
প্রমাণচিহ্নই যেন নিসর্গশোভায়
আড় ভেঙে কল্পনাও প্রসবের সম্পূর্ণতা চায়

যদিও দর্শনমাত্র ভুলে যাই
দিদি হও...

শ্লোকের গানে কবিতা বলে
তোমাকে পটাই।

সম্মোহন

উদ্বেগ গিয়েছে উড়ে
পাখি জানে ঝড় এলে ডালে বসে থাকার পদ্ধতি
আমাকে দিয়েছে ঢেকে খাতা
পাতার তিমিরে লিখবার চেষ্টা।
গম্ভীর বীণার গান উঠে আসে
শাড়ি তাঁর জ্যোৎস্না নিয়েছে
প্রতিবিম্ব সয়ে গেলে হাঁস ওড়ে

সরস্বতী বাহন ছাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে।

সঙ্ঘমিত্রা হালদার

শুধু ক্ষয়রোগ, আর...

বিলিতি মদের মতো শুধু একগ্লাস শৌখিনতা
এছাড়া অমরত্ব বলে আর কোথাও কিছু আছে কি!

জিয়ন কাঠির মতো শুধু বাঁচিয়ে রেখেছ আবর্ষকাল
তবু কোথাও কোনো ধানি রঙের মাঠ পড়ে নেই
এভাবে শরৎও অভ্যর্থনা জানাতে পারে না মহিরুহকে
বর্বরতার কাছে এর বেশি আর প্রশ্ন কোরো না

পাহাড় যেভাবে সানুদেশ পর্যন্ত বিছিয়ে থাকে আভূমি
শুধু সেভাবে বর্ষান্তকাল পর্যন্ত নমস্য প্রার্থনায়
সম্মতি নাও কেবলমাত্র একটা চুম্বনের

ক্ষয়রোগের মধ্যেই উঠে আসুক — ফলন্ত মাঠ।

জীবিতের কাছে এর বেশি অমরত্বের খোঁজ কোরো না
অবশ্যম্ভাবী পতনের মতো সেখানেও কোনো শব্দ নেই।

অভিজিৎ চক্রবর্তী

উত্তরায়ণ অথবা টিভি সিরিয়াল

ঠিক ছিল, কোপাই পেরিয়ে আমরা উঠব
উলু গাছের বাড়ি

আমরা খালি দিন গুনব আর তার কিনার ঘেঁষে
ছলাৎ ছলাৎ জল বেড়ে যাবে

তিরিশ বছর পর আসবে এক
মাঝবয়সী ক্যামেরাম্যান

তখন এই কর্কটক্রান্তি রেখার উপর
ছায়াহীন, একুশে জুন

নকল ছবি

উঁচু ইমারত উঠে ভ্রূণতত্ত্ব নষ্ট করে দেয়
নন্দলাল পাহাড়ের সানুদেশে বাসা বাঁধে
পূর্ণিমা রাতে সেই ফাঁদ পাতে
ত্রিকোণমিতি জানলে যা হয়...

অভিমন্যু মাহাত

সম্পর্ক

ছোটো বউয়ের দুয়ারে এক হাঁটু কাদা
ছৈলকে নামিল গেঁড়ি মাছ।
তালপাতের পেঁপটি বাজাতে পারে না বড়ো বউ
দুয়ারে দাঁড়ায়, খোঁজে
ছোটো দেওরের কাছে গেঁড়ি মাছের
তরকারি

ভিজে কথা

চেনা আঁকাবাঁকা পথ লুকোচুরি খেলে ডুবে গেল।
মধ্যরাতে আমাদের ভিজে কথাগুলি পাতায় রাখি

উনুনের পাশে ছোটো-ছোটো ফুল
পিঁপড়ের দল। আহত চাঁদের আলো

বাতাসে ভাসছে হলুদের গন্ধ

ঋত্বিক মল্লিক

কাব্যগ্রন্থ

সব কথাই শেষকালে কবিতা হয়ে যায়
তা সে যতই কর্কশ অথবা মধুর হোক,
যত গালাগাল অথবা যতই প্রতিপক্ষ থাকুক;
ছন্দও থাকে, শ্বাস নেওয়া আর শ্বাস ছাড়ার মধ্যে
থাকে নীরবতা — চোখের পলক ফেলার মতো

যত ঝগড়া করেছি জীবনে, বলেছি খারাপ কথা
ততবার নিজেকেই বলেছি আসলে ভালোবাসি
দীর্ঘদিন বাদে জীবনের সব বলা কথা আবার
ইচ্ছে হয় শুনি, সব তুচ্ছ আর নাটুকে হয়তো
মামুলি হাওয়ার মতো বয়ে গেছে এদিক-সেদিক

প্রতিটি অতীত কথাতেই যেন কষ্ট লেগে থাকে।

গাছ

আমাকে ক্ষমা করতে না পেরে ঈশ্বর গাছ হয়ে গেছে
এই যে বৃষ্টিভেজা ঘাস, মাটি আর হাওয়া
জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে; পৃথিবী উষ্ণ হলে
কিছু কথার মতো অনবরত সব পতঙ্গ
সার দিয়ে নেমে যায় পাতালের দিকে

মানুষও কখনো যায়, এইভাবে, স্বভাবের টানে
মানুষও কখনো যায় অঙ্গীকার করতে-করতে
অঙ্গীকার আসলে কথোপকথন — লেখা থাকে
গাছের নরম ত্বকে; ওইখানে আঘাত করি যদি
ব্যথা পায় ঈশ্বর, রাত অনেক হলে সবুজ
ঢেকে দেয় ক্ষতস্থানগুলি, সকালে মানুষ...

রাজদীপ রায়

ব্যাপারী

লুপ্ত দাবাছক সাজিয়ে উদোম খেলোয়াড়; পুনরায়
নাম লিখেছি বালির অক্ষরে, যক্ষের মতো দ্বিধাহীন

পাখির যাবতীয় নিষেধ অগ্রাহ্য করে অঝোর
ধারাপাতে; খুঁজে পেয়েছি গুপ্ত শ্লেষবাঁক

গভীর শোকপথে যাবার এটাই একমাত্র শ্রম...

যোগ্য শিশির হলে তুলে নিও পরশপাথর।

অরিন্দম রায়

কুলি টাউনের কবিতা

১
নিয়মিত ভোর হয়, জঞ্জাল গাড়ি আসে।
সূর্যের গায়ে কালো ছোপ। আমরা চিমনি
সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যাই।

২
বুধবার — উৎসবমুখর, হোসিয়ারি হুররায়
ভরে যায় দেবাশিসের সেলুন

বুধবার হোসিয়ারি জেগে ওঠে
কলকাতার মেয়েদের ঘরে
হাওড়ায় এইডস আসে, বুধবার
কলকাতায় যায়

৩
হাওড়ার ছেলেরা সাইকেল নিয়ে প্রেম
করতে বেরোয়, বিকেলে মেয়েস্কুল
ছুটি হয়ে গেলে।
হাওড়ার মেয়েরা অকারণ হাসে, দ্রুত
যৌবনবতী হয়। কলকাতার দ্যাখাদেখি
গ্রিটিংস কার্ড কেনে
'পুষ্পশ্রী' হলে গিয়ে প্রসেনজিৎকে
ভালোবেসে ফ্যালে

হাওড়ার ছেলেরা এখনও সাইকেল নিয়ে
প্রেম করতে বেরোয়।

হাওড়া শহরের প্রেমে এখনও তেমন গতি আসেনি

৪
হাওড়া — পাঁচশো বছরের পুরোনো
গুবরে পোকা। উলটে পড়ে আছে
উঠে বসছে না!

একটি আধুনিক রূপকথা

শৈবাল সরকার

'...অন্তিম মিলের
মুদ্রণ-প্রয়াস আজও বাণিজ্যসফল'

প্রকাশকদের সাথে-সাথে কবিরাও জেনে গেছেন এই মুনাফা-সমীকরণ। ফলে একইরকম ছন্দে, মিলে, বডি-ল্যাঙ্গুয়েজে ভরে গেছে সারি-সারি বুক শেলফ। আর সন্ত্রাসবাদীদের মতো কিছু স্বপ্ন-দেখানো কবিতা অসহায় ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রতিরোধের আশায়, হিংস্র সমর্থনের আশায়। এরকমই কিছু কবিতার গোপন বৈঠকের ছবি আমরা পেয়ে যাই অভীক মজুমদারের *'লিরিকবাহিনী'* কাব্যগ্রন্থে। *'মোড়ের মুখে অক্ষরের নাড়িভুঁড়ি পড়ে/ তাকে ঘিরে প্রচলিত ভিড়'* (তাম্রশাসন)। আর এই ভিড়ের দিকেই অভীক ছুঁড়ে দেন — *'নির্বিচার হত্যা থেকে মুখ তুলে দেখেছো কখনো/আমার লুকোনো চিঠি, প্রতিরোধ, আরেক রকম?'* (কাঙাল)। আর এ প্রতিরোধ কোনো প্রার্থনাসংগীত নয়। এ প্রতিরোধ প্রকাশ্যে হিংসার কথা বলে। বলে, *'আঙুল, ইস্পাত, চাপ... চাপ দাও, এখানে ট্রিগার!'* (কাঙাল)।

অভীকের কবিতায় বারবার উঠে এসেছে এক অসহায়তার কথা। *'জানোই তো আমি কত অসহায়, তায় জলে হাঙর, পুলিশ'* (আঁচড়)। এই অসহায়তা বেশিক্ষণ কবির ব্যক্তিগত থাকে না। কারণ আমরা আগেই পড়ে ফেলেছি — *'আমি মানে আমার ভেতরে যারা হাঁটুগেড়ে ব'সে'* (কিংবদন্তী)। আমরাও ক্রমশ জড়িয়ে পড়ি। *'বিপ্লব'* কবিতাটি পড়লে অবধারিতভাবে মনে আসে নকশাল আন্দোলনের কথা। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে অনেকটা সান্ত্বনার মতো ভেসে আসে — *'উদ্ভিদবিহীন দেশে এই সম্ভাবনা নিয়ে বাঁচা — / তোমার বাড়ির সামনে হয়তো বা, কৃষ্ণচূড়া ছিল।'* (বিপ্লব)।

এর আগে আমরা ফালগুনী রায়ের কবিতায় পড়েছি *'লর্ডবুদ্ধ — অহিংসার বদলে আমরা চাই / রাইফেল শান্তির উৎস হয়ে থাক —'*। কিন্তু আজ যখন সমস্ত বিতর্কিত রাজনৈতিক গন্ধ মুছে ফেলে কবিরা মিউজিক্যাল চেয়ার খেলায় ব্যস্ত, তখনও অভীকের কবিতার ইঙ্গিত গেছে রাইফেলের দিকে। কখনো আক্ষেপে *'হে আমার বাংলাদেশ, মন দিয়ে যুদ্ধও শেখোনি?'* (চণ্ডাল) আবার কখনো উসকানিতে — *'পাহারাওলার হাতে রাইফেল অপেক্ষায় থাকে / ছিনিয়ে নিবি কে...'* (আঁচ)। অথচ কোনো সাড়া আসে না। অভীক লেখেন — *'এখন আকাশগুলি রিটায়ার্ড কেরানির দিনলিপি, চুপ / এখন বাতাসে কোনো শব্দ নেই দৃশ্য নেই এখন তোমার মুখ হিমপ্রবাহের মতো / শাদা'* (লিরিকবাহিনী-৫)। অথবা যখন লেখেন *'রুলিপরা হাত শুধু স্বরবর্ণ চেনে জানে কীভাবে উঠোনে থাকে পেত্নির হাঁউমাঁউ চোখ'* (লিরিকবাহিনী-১)। আর যখন আমাদের উদ্ধারে, সহমর্মিতায়, সমর্থনে কেউ এগিয়ে আসে না। কোনো লালকমল-নীলকমল নেই। কোনো ঈশ্বর নেই। *'কান্না থামাবার মতো কেউ নেই / ওজনযন্ত্রের সামনে শুধু এক ক্রোধ এসে টয়-পিস্তল রেখে গেছে।'* (ভারতবর্ষ-২)। আমাদের গুন্ডামি ও প্রতিরোধ উভয়েরই মুখোশ খুলে পড়ে। অথচ কেউ দেখতে পাই না। *'ওখানে অন্ধের কাছে দীক্ষা নেয় জাতীয় পতাকা'* (দৃশ্যপট)।



***লিরিকবাহিনী*। অভীক মজুমদার**
অনুষ্টুপ। জানুয়ারি ২০০৪। পৃষ্ঠা ৬৪
প্রচ্ছদ প্রৈতি রায়। মূল্য তিরিশ টাকা

এভাবেই ক্রমাগত নিখুঁত আবহনির্মাণ ও অনিবার্য কিছু ক্লাইম্যাক্স-ভরা এই কাব্যগ্রন্থ ক্রমশ এগিয়ে গেছে সেই আকাশের দিকে *'যেখানে আকাশ ঢেকে উড়ে যাচ্ছে দৈত্যাকার ফিনিক্স, তার একটি পালক ঝরে পড়েছিল আমাদের ডিঙা-য়...'* (আধুনিক রূপকথা)। ফিনিক্সের উপহার তাঁরই প্রাপ্য যিনি লেখেন, *'আমার আকাশ মানে অক্ষরের / অন্য জলপথ / বেয়ে ফেরা'* (পরিচয়)। তাঁর ভাষায় — *'ভাষা কোন গুল্ম যাকে বেয়ে বেয়ে ওঠে শাদা রস ওড়ে তুলোটে বীজের ডানা'* (প্রশ্ন, উত্তরের মতো)।

অভীকের কবিতায় প্রেম ও রাজনীতি, হেড-টেলের মতো মুদ্রার দুই বিপরীতপার্শ্বে নয়। প্রেমবিহীন রাজনীতির ভয়াল আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টাই তার কবিতা। তাই এখানে প্রেম ও রাজনীতি মিলে-মিশে তৈরি করেছে এক সীমাহীন গোলক (পাস্কালের মতে, যার কেন্দ্রস্থল সর্বত্র এবং যার কোনো পরিধি নেই) কেননা গোলকই সবকিছু সুষমভাবে ধারণ করতে পারে। 'স্বপ্ন' কবিতায় আমরা পড়ি — *'কে জানে কখন হবে / গণজাগরণ / আর / তোমার পিঠের তিলে অন্ধ ভালোবাসা আমি / ঠোঁটে করে পুঁতে দিয়ে যাব।'* প্রেম ও রাজনীতির এই দুরন্ত মিশেল রয়েছে প্রতিটি কবিতায়। অভীক প্রকাশ্যে হিংসার কথা বলেন। বলেন ভালোবাসার কথা। বলেন — *'বিস্মৃতি নয় ভয়ানক চোরাটান তোমার আঙুলে / বারুদগন্ধ রাই, এসো ভালোবাসি অসুখে কষ্টে ঝড়ে, মুঠো খুলে ধরো ভাঙা রাইফেলটাই...'* (প্রকাশ্যে হিংসার কথা বলি) যা বইটিকে ঐচ্ছিক নয়, ক্রমশ অবশ্য-পাঠ্য করে তোলে।

Elite-ill-magazine না A Little Magazine?

আরও একবার ভাবছি। পরের পাতায়, তাই এসব নিয়েই এক আমন্ত্রিত গদ্য। ভাবুন আপনারাও! তারপর লিখে জানান 'বোধশব্দ'-র দফতরে...

লিটল ম্যাগাজিনের নামে হচ্ছেটা কী!

সন্দীপ দত্ত

এই মুহূর্তে বাংলা ভাষায় অজস্র লিটল ম্যাগাজিন বেরোচ্ছে — অজস্র। সংখ্যাটা কম-বেশি ৮০০-৮৫০ তো হবেই। এর সবই কি লিটল ম্যাগাজিন? লিটল ম্যাগাজিনের নামধেয় ছদ্মবেশী কিছু অকাগজের সংখ্যাও বাড়ছে দিন-দিন। এখন অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছে সবাই সম্পাদক, সবই লিটল ম্যাগাজিন। বিজ্ঞজনরা বলেন, লিটল ম্যাগাজিনের আবার সংজ্ঞা কী! যা ছেপে বেরোবে কাগজে তা-ই চিহ্নিত হবে লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে; বঙ্গীয় আঁতেল ভাষায় যা 'লিটল ম্যাগ'। এহেন লিটল-ম্যাগির সংখ্যা বাড়ছে। একসময় বলা হত 'শতজলঝর্ণার ধ্বনি' কিংবা 'শত পুষ্প বিকশিত হোক'। বলা আজও হয়। এখন এর মধ্যে যে তাৎপর্য রয়ে গেছে তা হল শত ভাবনার বিকাশ হোক যে যার মতো করে। শুনতে ভালো লাগে, ভাবতে ভালো লাগে। শত কাকলি তো আর পাখির কূজন নয় — অহেতুক চিৎকারের কর্কশ ধ্বনি। শত-শত এই যে কাগজ ছাপার মৌলবাদী অভিযান তা কোন যানে চেপে কোন উজানে পৌঁছোচ্ছে? এ পোড়া দেশে অনেক কাগজ বেরোয় লিটল ম্যাগাজিনের বাকল পরে, যে বাকল খুললেই বেরিয়ে আসে হাড়-জিরজিরে নড়বড়ে কিছু শরীর — যার কোনো অক্ষর নেই, শব্দ নেই, বাক্য নেই, ক্রিয়া নেই, অব্যয় নেই, চেতনা নেই, প্রাণতা নেই। তবে আছেটা কী? শব-সাধনা শবেদের উৎসব হতে পারে, শব্দের জলসা নয়। শব-সম্পাদকের রাজত্বে সবাই রাজা, অতএব বাজনা বাজা। কাল কবিতার মস্করা, আজ কবিতা পত্রিকার হুহুম সম্পাদক! এভাবেই চলেছে শব্দের শবেদের ঘ্যাঁঙর-ঘ্যাঁঙর। চলমান বঙ্গসংস্কৃতির পরতে-পরতে উড়ছে হাজার-হাজার রিম কাগজের নৃত্যশীল উন্মাদনা। গায়ে একটা রঙিন জামা পরিয়ে দিয়েই চালাও পানসি বেলঘড়িয়া। ডেক্সটপের আঙুল-স্পর্শে এখন প্রতি মাসে, প্রতি পক্ষে-পক্ষে কবিতার বিলাসিতা বা বিবমিষা। নবীন কবিদের চাষ চলছে বঙ্গের উর্বর ভূমিতে। চাষারা শুধু কবিতা ছাপিয়েই চাষ করছে না, বেশ ড্রাম-তাসা বাজিয়ে কবিতা চুৎসব করছে, কোবতের কেলাস করছে। বাহবা! কী হচ্ছেটা কী এসব! লিটল ম্যাগাজিনের নামে ভাঁড়ামির কাগজ, অকাগজ বাড়ছে, আর হু-হু করে বাড়ছে কাগজের দাম! এত অহেতুক বই বেরোয়, অর্থহীন পত্রিকা বেরোয় বাংলা ভাষায়, তারই ফল বোধকরি। সসেমিরা অবস্থা সার্বিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। পণ্যসভ্যতার পুণ্যবাণী পূর্ণ কর পূর্ণ কর হে ভগবান। সব ল্যাজ উঁচিয়ে ছুটছে পূর্ণতার মহত্তর সন্ধানে। সবাই সম্পাদক হতে চাইছে — এ মোহ যাবে কোথায়!

অথচ তবে তবু তথাপি একথা বলা অনস্বীকার্য, এই মুহূর্তে বাংলা ভাষায় লিটল ম্যাগাজিনের ভালো-ভালো কাজও হচ্ছে। যথেষ্ট পরিণত মননের এইসব কাজগুলি বাংলা সাহিত্যচর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ, একনিষ্ঠ ও গভীর করে তুলেছে। সন্দেহ নেই, লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনিবার্য ধারা। এই ধারাকে বিনষ্ট যারা করছে, যারা সেইসব কাগজকে মহৎ লিটল ম্যাগাজিন আখ্যা দিচ্ছে, লিটল ম্যাগাজিনের নামে ভেক প্রদর্শনী করছে — তাদের সাপ-ব্যাঙ কাণ্ডকারখানার কোনো ক্ষমা নেই।

দশম সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ
ভাদ্র ১৪১৩ : সেপ্টেম্বর ২০০৬
বিনিময় মূল্য : ২০ টাকা